বঙ্কিম চিত্র

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী

বঙ্কিমচিত্র

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী

বঙ্কিম চতুষ্পাঠী, কাঁটালপাড়া।

দ্বিতীয় সংস্করণ

—প্রকাশক—

শ্রীজগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,

কমলালয়, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

[মূল্য ১৲।

প্রাপ্তিস্থান—
কমলাবুক ডিপোঃ লিঃ
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
প্রিণ্টার—সুরেশচন্দ্র মজুমদার
৭১।১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৫৮।২৮

ভূমিকা।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়ের বঙ্কিমচিত্রের একটা ভূমিকা লিখিয়া দিব, অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম। তখনও তাঁহার "চিত্রাবলী" দেখি নাই। কেন যে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম তাহাও মনে নাই। আমি প্রায় কখনও কোনও গ্রন্থকারের, বিশেষতঃ যাঁহাদের সঙ্গে বিশেষ বন্ধুতা বা পরিচয় আছে, তাঁহাদের গ্রন্থের কোন প্রকারের সমালোচনা করি নাই। যদি গ্রন্থ প্রশংসার যোগ্য হয়, সে প্রশংসা যতই নিরপেক্ষ ভাবে করি না কেন, লোকের নিকটে বন্ধুতার খাতির ও পক্ষপাতিত্ব দোষ হইতে কিছুতেই মুক্তি পাইবার সম্ভাবনা নাই। যদি সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে যাইয়া গ্রন্থের নিন্দা করিতে বাধ্য হই, তাহাতে বন্ধুবিচ্ছেদ হইবার সম্পূর্ণ আশঙ্কা থাকে। এই ভয়ে আমি সর্ব্বদাই কোন পরিচিত লোকের গ্রন্থাদির সমালোচনা করিতে নিতান্ত নারাজ। শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়ের এই গ্রন্থেরও কোন প্রকারের সমালোচনা করিতে আমি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়াছিলাম। কেন যে তাঁহার নিকট অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়াছিলাম এখন তাহাও ভাবিতে পারি না।

তবে তাঁহার প্রবন্ধাবলী পড়িতে পড়িতে একটা অজুহাত মনে আসিয়াছে। রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে মনে পড়ে কোথাও যেন ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত এই বিশেষণ হইতে পৃথক করিয়াছিলেন। কোন প্রকারের

পাণ্ডিত্যাভিমান আমার নাই। বেদান্তশাস্ত্রে কিছুমাত্র অধিকার আছে এরূপ কল্পনাও আমি কখনও করি না। সুতরাং বেদান্ত-শাস্ত্রী মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের বিচার আমার অধিকারের বহির্ভূত। তবে তাঁহার সঙ্গে যে সামান্য পরিচয় আছে তাহাতে শাস্ত্রী মহাশয়কে আমাদের নব্যশিক্ষিত ইংরাজী নবিশদিগের শ্রেণীতে কিছুতেই ফেলিতে পারি না। ইংরাজী বর্ণ পরিচয় পর্য্যন্ত তাঁহার আছে কিনা এ খোঁজও কোন দিন করি নাই। থাকিলেও আমাদের আধুনিক পশ্চিমের আমদানী শিক্ষা তাঁহার চিত্ত ও চরিত্রকে যে দখল করিতে পারে নাই এ প্রতীতি তাঁহার সঙ্গে আলাপ পরিচয়েই বদ্ধমূল হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র এই য়ুরোপের আমদানী সাধনাতে আমাদিগের মধ্যে একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বঙ্কিম-চন্দ্রের কি রসসৃষ্টি, কি সাহিত্য সমালোচনা, কি ঐতিহাসিক গবেষণা, সকল বিষয়েই এই সিদ্ধির অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন ধর্ম্ম খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর "natural Religion"এর এবং খৃষ্টীয়ান "একান্তীন" (Unitarian) দিগের সমঞ্জসীভূত উন্নতির বা Harmonious development এর আদর্শে গড়িয়া উঠিয়াছে এ কথা অস্বীকার করা অসম্ভব। যে-ভাবে ফরাসী পণ্ডিত মশোঁ রেনাঁ খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল্ ছাঁকিয়া যীশুখৃষ্টের জীবনের একটা লৌকিক ইতিহাস গাঁথিয়া তুলিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র সেই ভাবে ঠিক সেই সূত্র অবলম্বনে মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, হরিবংশ প্রভৃতি ছাঁকিয়া শ্রীকৃষ্ণের একটা লৌকিক ইতিহাস গড়িয়া তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। আধুনিক য়ুরোপীয় সাধনার দর্পণে ভগবদ্-

গীতার শিক্ষাকে প্রক্ষেপ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র গীতাধর্ম্মের প্রতিচ্ছবি তুলিয়া লইয়াছেন। ইহাতে দোষের কথা কিছুই হয় নাই। দেশ, কাল, পাত্র উপযোগী করিয়া আমাদের সনাতন শিক্ষা ও সাধনাকে ব্যাখ্যা করিতে না পারিলে কিছুতেই তাহা আধুনিক বাঙ্গালীর চিত্তে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিবে না। বঙ্কিম-চন্দ্র এই কাজটি করিতে যাইয়া আধুনিকের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন কিন্তু প্রাচীনের মর্য্যাদা নষ্ট করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের সকল উপন্যাস আমাদিগের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্যই লিখিত। তাঁহার আগেকার ক'খানি, কপালকুণ্ডলা, দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, সমুদায়ই য়ুরোপীয় উপন্যাসের অনুকরণে নহে কিন্তু প্রেরণায় রচিত, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। সে প্রেরণা বিষবৃক্ষেও যে নাই ইহা মনে করি না। তবে বিষবৃক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি বাঙ্গালীর আধুনিক পারিবারিক জীবনের অন্তঃপুরে নিঃসঙ্কোচ প্রবেশলাভ করিয়াছে। সূর্য্যমুখী বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে একথা সত্য হইলেও কুন্দনন্দিনী বঙ্কিমচন্দ্রের নূতন সৃষ্টি। এ সৃষ্টি শতবর্ষ পূর্ব্বের বাংলায় সম্ভব হইত না। বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ-কালের সৃষ্টিও কেবল স্বাদেশিক নহে, কেবল বিদেশীও নহে। য়ুরোপে অষ্টাদশ, উনবিংশ শতাব্দীতে যে রাষ্ট্রীয় ও সমাজিক স্বাধীনতার আদর্শ ফরাসী-বিপ্লবের বিষময় মন্থনদণ্ডের মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র সেই আদর্শকেই গীতার নিষ্কাম কর্ম্মযোগের সঙ্গে মিলাইয়া এই বিশ্বজনীন আদর্শের দ্বারা উদ্ভাসিত করিয়া তাঁহার আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারামকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে আধুনিক। তাহার পোষাক পরিচ্ছদ যাহাই হউক না কেন প্রাণটা নিখুঁৎ modern

ঐ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজী নবিশদিগের জন্যই এসকল লিখিয়া গিয়াছেন। যাঁ'রা প্রকটভাবে ইংরাজী নবিশ নহেন, তাঁহাদের চক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের এ'সকল সৃষ্টি কেমন লাগে এ কুতুহল স্বাভাবিক।

পণ্ডিত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয় আমার মনে হয় অনেকটা এই কুতুহল নিবৃত্তির সাহায্য করিয়াছেন। এ চেষ্টা বহুল পরিমাণে সফলও হইয়াছে। তাঁহার বঙ্কিমচিত্রে বঙ্কিমের অনেকগুলি রসসৃষ্টি বেশ সুন্দর হইয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের নায়ক নায়িকাকে তিনি অনেক স্থলেই "সাহিত্য-দর্পণের" দাঁড়ি পাল্লায় তুলিয়া ওজন করিয়াছেন। ইহাতে আধুনিকের প্রতিও অবিচার হয় নাই প্রাচীনেরও মর্য্যাদা হানি হয় নাই। বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হইলেও বর্ত্তমান যুগেরই লোক। তাঁহার বহিরঙ্গ যতই প্রাচীনের অভিনয় করুক না কেন, অন্তরঙ্গ আধুনিকের প্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। তাঁহার ভাষা প্রাচীন পণ্ডিতী ভাষা নহে, আধুনিক বঙ্কিমী ভাষা। তবে প্রাচীন পণ্ডিতদিগের কোন কোন অভ্যাস তিনি একেবারে বর্জ্জন করিতে পারেন নাই। এই জন্য মাঝে মাঝে শব্দবাহুল্য এবং উপমাবাহুল্যের প্রাচীন প্রয়াস দৃষ্ট হয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই চিত্রাবলী সুখপাঠ্য হইয়াছে। চরিত্রবিশ্লেষণে শাস্ত্রী মহাশয় অধিকাংশ স্থলেই বেশ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। তবে সকল সময়ে নির্ভয়ে বঙ্কিমের রসসৃষ্টিকে সম্ভোগ করিতে পারেন নাই। সম্ভোগের মাঝখানে প্রচলিত সমাজ শাসনের বিভীষিকা জাগিয়া শাস্ত্রীমহাশয়ের অকৈতব ও নিঃসঙ্কোচ রসোপাসনায় উপদ্রব ঘটাইয়াছে। আর এখানেও শাস্ত্রীমহাশয়

একেবারে পরাভব স্বীকার করেন নাই। নায়ক নায়িকার সহজ রসসম্বন্ধের সম্বর্দ্ধনা করিতে করিতে কি জানি ইহাতে প্রচলিত দাম্পত্য জীবনের ও সতীত্বের আদর্শের মর্য্যাদা নষ্ট হয়, এই ভাবিয়া "হাতে সূতো বাঁধা প্রেমেও" যে রসস্ফূর্ত্তির সম্ভাবনা আছে এই আশ্বাস দিবার জন্য বিবাহ-সংস্কারের "মন্ত্রশক্তির" প্রভাবের দোহাই দিয়াছেন। এইখানেই শাস্ত্রী মহাশয়ের "ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের" প্রকৃতিসিদ্ধ শ্রুতিস্মৃতির বশ্যতার প্রমাণ পরিচয় দিয়াছেন। এই মন্ত্রশক্তির আপীল আধুনিকের অন্তঃকরণে গ্রাহ্য না হইতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রীমহাশয়ের পক্ষে এই মন্ত্রশক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করাও অসম্ভব ছিল। আর মনস্তত্ত্বের বিচারেও শাস্ত্রী মহাশয় যাহাকে মন্ত্রশক্তি কহিয়াছেন বহু পুরুষানুগত সামাজিক সংস্কাররূপে আমাদের চিত্তের এবং চরিত্রের উপরে যে অসাধারণ প্রভাব নাই একথা বলা যায় না। সুতরাং ঐ সকল স্থলেও শাস্ত্রীমহাশয় যদিও প্রাচীন পণ্ডিতদের অজুহাতের আশ্রয় লইয়াছেন, "সংস্কার-শক্তি" অর্থে যে এই মন্ত্রশক্তি সত্য নহে ইহা বলিতে পারি না। তবে কথাটা আধুনিকের কানে লাগে।

যাহা হউক রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়ের বঙ্কিমচিত্রে অনেকগুলি মনোরম ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। মূল সৃষ্টি বঙ্কিমেরই বটে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ফুল হইতে মধুকর যেমন মধু আহরণ করিয়া মধুচক্র নির্ম্মাণ করে, বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয় সেইরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব্ব সৃষ্টি সকল হইতে রসমূর্ত্তিগুলি সংগ্রহ করিয়া এই চিত্রগুলি প্রকট করিয়াছেন। অলমতি বিস্তরেণ ইতি।

ভবানীপুর, কলিকাতা।
১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

উপহার।

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের

করকমলে—

কল্যাণীয়, হে মোর প্রিয়, গুণস্নিগ্ধ-কায়,
এ বি-চিত্র বঙ্কিমচিত্র দিলাম তোমায়।
জানি আমি, করিবে না—
করিতেও পারিবে না
অনাদর—হ'লেও তুচ্ছ এ চিত্র আমার;
ইহাই ভরসা, আশা, আশ্বাস অপার।

আশীর্ব্বাদক—গুণমুগ্ধ গ্রন্থকার
শ্রীরামসহায় দেবশর্ম্মা বেদান্তশাস্ত্রী।
বঙ্কিম চতুষ্পাঠী, কাঁটালপাড়া।

নিবেদন

কিছুদিন পূর্ব্বে "প্রাচীন চিত্র" নামক পুস্তকখানি যখন প্রকাশ করি, তখন, এতটা ভরসা করিতে পারি নাই যে, বঙ্গবাসী, প্রবাসী, তত্ত্ববোধিনী, ব্রাহ্মণসমাজ, অবতার, আনন্দবাজার, আত্মশক্তি, নবযুগ, মানসী ও মর্ম্মবাণী, নায়ক, হিতবাদী, বসুমতী প্রভৃতি পত্রিকার সমালোচকগণ ইহাকে এমত আদর ও স্নেহের চক্ষুতে দেখিবেন। সেই ভরসায় আমি আবার "বঙ্কিমচিত্র" লইয়া উপস্থিত হইলাম। আশা হয়, ইহাকেও সেইমত আদরের চক্ষুতেই দেখিবেন। তবে "আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানং।" অগ্রে কিছু বলাও সমীচীন হয় না।

বঙ্কিমচিত্রের চরিত্র সমালোচনাগুলি প্রথমে নব্যভারত, নারায়ণ, সাহিত্যসংহিতা, জন্মভুমি, নবযুগ ও অর্চ্চনা প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়; সাহিত্যসম্মেলনে, সাহিত্যসভায় এবং বঙ্কিমসাহিত্যসম্মিলনীতে পঠিতও হয়। অবশ্য সেগুলি আবার নূতন করিয়া লিখিয়া, পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও কিছু কিছু পরিবর্জ্জন করিয়া এই পুস্তকখানি প্রকাশিত করিলাম। "প্রাচীনচিত্র" পুস্তকখানি যাঁহার যত্নে লোকচক্ষুর গোচর হইয়াছিল—সেই পরম প্রীতিভাজন শ্রীযুত শীতলচন্দ্র রায়ের প্রতি অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

আমার পরম প্রিয়, কমলালয়ের শ্রীমান্ জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ই এই "বঙ্কিমচিত্র" পুস্তকখানি প্রকাশের কারণ। তাহার সহিত আমার আশীর্ব্বাদের সম্বন্ধ—সেই আশীর্ব্বাদস্বরূপে এই বঙ্কিমচিত্র তাহার করেই অর্পণ করিলাম।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।
বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলনী—কাঁটালপাড়া।
১৬ই বৈশাখ, ১৩৩৪।

বঙ্কিমচিত্র।

ভ্রমর ও রোহিণী।

ভ্রমর জলের ঝারি ; রোহিণী আগুনের শিখা। ভ্রমর প্রেম-ভক্তির নবমল্লিকা ; রোহিণী কাম-মোহের রক্ত ঝিন্টিকা। ভ্রমর স্নিগ্ধ চন্দনলতা ; রোহিণী তীব্র বিষবল্লী। একজন নয়নের আলো ; অপরজন মনের সুরা। এ উদ্দীপনা, ও উত্তেজনা। একটি মন্দাকিনী, অপরটি কর্ম্ম-নাশা। এটি দেবী, সতীত্বের কোকনদ ; ওটি দানবী, অসতীত্বের সপ্তচ্ছদ।

ভ্রমর পতির ধর্ম্মরক্ষার জন্য নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিল ; রোহিণী নিজের ভোগতৃপ্তির জন্য প্রণয়ীর ধর্ম্ম নাশ করিল। সতী নারী নিজের প্রাণ দিয়া প্রেমের-অপূর্ব্ব শক্তি দেখাইল ; অসতী রমণী প্রাণের মায়ায় কামের পঙ্কিল গন্ধ ছুটাইল। দেবী প্রেম ও ধর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয় রাখিয়া চিরস্মরণীয়া হইল। রাক্ষসী কাম ও স্বার্থপরতার মিলনক্ষেত্র হইয়া চির-ঘৃণাপাত্রী রহিল। একজন সমগ্র সম্পত্তি পতিকে দানপত্র লিখিয়া দিয়া অসীম তৃপ্তি-লাভ করিল ; অন্যজন প্রণয়ীর সর্ব্বস্ব শোষণ করিয়াও আকাঙ্ক্ষার জ্বালায় জ্বলিল। ভ্রমর ধীরে ধীরে সান্ধ্য তারার মত আসিল, ধীরে ধীরে অস্তে গেল। রোহিণী অকস্মাৎ খ-ধূপের মত জ্বলিয়া উঠিল, পরক্ষণেই জলাভূমিতে পড়িয়া মিলাইয়া গেল।

ভ্রমরের মত কাল বলিয়াই "ভ্রমরের" ভ্রমর নাম। ভ্রমরেরই মত হাসিয়া খেলিয়া আপনার ভাবে থাকিত বলিয়াও ভ্রমর নাম। ভ্রমর সতীর এক-জাতীয় আদর্শ। পাপিষ্ঠ হইলেও, পতি সতীর আদরের বস্তু ও ভক্তির সামগ্রী, ইহা সে মানিত না। লম্পট ও হত্যাকারী স্বামীর দাসীত্বই নারী-জীবনের সার্থকতা, ইহা সে চাহিত না। পতির জড় দেহ অপেক্ষা সে পতির অকলঙ্কিত মন ও পবিত্র আত্মাকে অধিক ভালবাসিত। পতির ধর্ম্ম, চরিত্র এবং মনুষ্যত্বকে সে অনেক বড় করিয়াই দেখিত। নিজের সংসারসুখ, সাধ আহ্লাদ ও ভোগস্পৃহা মিটানই নারীজন্মের উদ্দেশ্য ইহা সে ভাবিত না। ভ্রমরের তুলনা ভ্রমরই।

ভ্রমর অভিমানের উন্নত সুমেরু, মনস্বিতার গভীর জলধি। অভিমানই তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব, অভিমানই তাহার অলঙ্কার। মনস্বিতাই তাহার জীবনের বন্ধন, মনস্বিতাই তাহার প্রাণের স্পন্দন।

অভিমানই ভ্রমরের গুণ। যে-[illegible]তায় আদর্শ সে গঠিত, তাহাতে অভিমান না থাকিলে ভ্রমর "ভ্রমর" হইত না। এ অভিমান উন্নত হৃদয়ের নিদর্শন। স্বামী তেমন আদর করিল না, মতে মত দিল না, আবদার জুলুম সহ্য করিল না, অমনই অভিমান। ভাল অলঙ্কার বেশ-ভূষা হইল না, পিত্রালয়ে যাওয়া ঘটিল না, কোন কারণে তিরস্কার খাইতে হইল, অমনই অভিমান,—এ অভিমানে ভ্রমর অভিমানিনী নহে। ভ্রমরের অভিমান উচ্চাঙ্গের। এই অভিমান লইয়াই সে আসিয়াছিল, আবার এই অভিমান লইয়াই সে এই সংসার ত্যাগ করিয়া গেল।

তবে প্রভেদ এই যে, প্রথম অভিমানটিতে ক্রোধ ও ক্ষোভ মিশ্রিত ছিল। দ্বিতীয় অভিমানটিতে ক্ষমা ও তৃপ্তি ওতঃপ্রোত ছিল। অভিমানের অগ্নিতে সে দিবারাত্রি জ্বলিয়া শেষে সেই অগ্নিকে মন্ত্রপূত হোমাগ্নি করিয়া তাহাতেই জীবন আহুতি দিল।

সাধারণ যুবতী নারীদের অভিমানের মধ্যে এই আত্মাহুতি নাই, পতিকে পাপ-পঙ্ক হইতে তুলিয়া আনিয়া দেবতা করিয়া গড়িবার শক্তি নাই। যৌবন-বিলাসিনীদের যে অভিমান, তাহা প্রকৃতই অস্বত্ব-সুখের নামান্তর, ভোগস্পৃহার ছদ্ম মূর্ত্তি ; সে অভিমান লইয়া ভ্রমর ঘর করে না। কলঙ্কের মসীকৃষ্ণ আধারে পতির কালামুখ সে দেখিতে চাহে না। ধর্ম্মের কাছে পতিত, সমাজের চক্ষুতে ঘৃণিত পতির এ অবনতি সে সহ্য করিতে পারে না। তাহার প্রাণের দেবতা, দেবতা না হইয়া যে বীভৎসকর্ম্মা দানব হইবে, ইহা সে পছন্দ করে না। পাপের তুষাগ্নিতে জ্বলিয়া, তাহার শ্রেষ্ঠ অর্দ্ধাঙ্গ যে ইহ-জীবনে এবং পরলোকে নরক ভোগ করিবে, ইহা তাহার অসহ্য : এই-জন্যই ভ্রমরের এই অভিমান-রূপ যুদ্ধ-ঘোষণা। নিজের প্রেম-দুর্গ অক্ষুণ্ণ রাখা গৌণ উদ্দেশ্য। পতির ধর্ম্ম-দুর্গ গৌরবোন্নত রাখাই প্রধান উদ্দেশ্য। পাপের বিরুদ্ধে এই যে যুদ্ধ, তাহতে নিজে ক্ষত বিক্ষত হই, তাহাতে ক্ষতি নাই ; পরিণামে কিন্তু পতির প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিবই করিব—এইরূপ মনোভাব লইয়াই ভ্রমর অভিমান করিয়াছিল।

পতি গোবিন্দলালকে পাপ-পথ হইতে ফিরাইবার জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করিতেও সে কুণ্ঠিতা হয় নাই ; এজন্য সে প্রাণপাত চেষ্টা করিতেও ত্রুটি করে নাই। প্রথম

অবস্থায় যখন রোগ (ভ্রমরের রোগ বলিয়া বুঝিবেন না) সামান্য ছিল, তখন সেই-মতই ঔষধের ব্যবস্থা সে করিয়াছিল। রোগ যখন দুঃসাধ্য হইয়া দেখা দিল, তখন সে উগ্রবীর্য্য ঔষধের ব্যবস্থা না করিয়া থাকিতে পারিল না। ফল অবশ্য ফলে নাই, তাহাতে ভ্রমরের কোন দোষ নাই। সে কাল, পতির অতৃপ্ত ভোগ-বাসনা মিটাইতে পারে নাই; রোহিণীর রূপ-সৌন্দর্য্যময় অগ্নির নিকট সে দীপালির মত নিষ্প্রভ হইয়া রহিল। ইহাতে তাহার দোষ কি? পতির প্রতি তাহার সন্দেহ অকারণ নহে। রোহিণীকে বাঁচাইয়া তাহার "ফুল্লকুসুম-কান্তি" অধর-যুগলে ফুৎকার দিয়া যেদিন গোবিন্দলাল গভীর রাত্রে উদ্যান হইতে আইসে, সেদিন ভ্রমরের অনুরোধ সত্ত্বেও "আর এক দিন বলিব বলিয়া" ভ্রমরের মনে সন্দেহের বীজ গোবিন্দলালই বপন করিয়াছিল।

ভ্রমর অভিমান করিয়া পিত্রালয়ে যায়, ইহাতে যদি তাহার দোষই হইয়া থাকে, তবে সে ঐ এক দোষের জন্য কি না করিয়াছে? কতবার ক্ষমা চাহিয়াছে, কতবার পায়ে ধরিয়া গভীর কান্না কাঁদিয়াছে; বিষয়সম্পত্তি দানপত্র করিয়া নিজে যে দাসী, তাহা পর্য্যন্ত প্রমাণ করিয়া দিয়াছে; গোবিন্দলাল তথাপি ফিরে নাই। রোহিণীর প্রতি তীব্র আকর্ষণ, তাহার রূপযৌবনভোগের অদম্য লালসা তখন গোবিন্দলালকে পশুর মত অধম করিয়াছে; ভ্রমর কি করিবে?

ভ্রমর যদি অভিমান করিয়া পিত্রালয়ে নাও যাইত, তাহা হইলেই কি গোবিন্দলাল রোহিণীর তীব্র আকর্ষণ হইতে বিমুখ

থাকিতে পারিত ? তাহার রূপভোগের লালসাকে দমন করিতে পারিত ? রোহিণীর লালসায় আপাদমস্তক জর্জ্জরিত থাকিয়া কি আর ভ্রমরের সহিত পূর্ব্বের মত প্রেমের খেলা খেলিতে পারিত ? বিষের জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া, প্রেম-জীবনে জীবন্মৃত থাকিয়া গোবিন্দলাল কি করিত, কি না করিত, তাহা তাহার ভাগ্য-বিধাতাই বলিতে পারেন।

ভ্রমর ভালবাসার যে-জাতীয় আদর্শ, সেই-দিক্ দিয়া বিচার না করিলে ভ্রমরকে বুঝা যাইবে না। অন্য-জাতীয় আদর্শের দিক্ দিয়া বিচার করিলে কিন্তু ভ্রমরের স্থান উচ্চে নহে, বরং নিম্নে, ইহাই আমরা বলিব। দুইটি দিক্ দিয়া এক সঙ্গে বিচার করিলে দোষে গুণে ভ্রমর, ভ্রমরই।

ভ্রমর আমোদে বালিকা, সোহাগে তরুণী, বিপদে প্রৌঢ়া। যেমন সে নবনীসম স্বভাবতঃ দ্রবনীয়, তেমনই চন্দ্রকান্তমণিসম কঠিন। পায়ে ধরিয়া যে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেয়, সে কতই কোমল। পতির সাহায্য-প্রার্থনার উত্তরে সে যেরূপ নির্ম্মম পত্র লেখে, তাহাতে সে কতই অকরুণা। ভ্রমর অভিমানিনী হইলেও গুরুতর ব্যাপারে কিন্তু একেবারে নিরভিমানিনী। এক—পিত্রালয়ে যাওয়া-রূপ অপরাধের জন্য কত দিন সে ক্ষমা চাহিয়াছে, তাহা কি নিরভিমানিতার লক্ষণ নহে ? মৃত্যুকালে "কুন্দের" মত ভ্রমর মর্ম্মভেদী অভিমানের কথা একটিও বলিয়া যায় নাই, ইহাও কি নিরভিমানিতার নিদর্শন নহে ? নিরভিমানিতা যে আদর্শ প্রণয়ের লক্ষণ, তাহা ভ্রমরের ভালবাসাতেও যে না ছিল তাহা নহে।

ভ্রমর যখন আনন্দময়ী, তখন সে শিশুর মত হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আইসে, প্রেমমুগ্ধা কিশোরীর মত গদ-গদ-ভাবে বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়ে, সুচতুরা তরুণীর মত কত চতুরালি, ও রঙ্গরস করে, সে সময়ে তাহার চপলা মূর্ত্তি। আবার যখন সে গৌরবময়ী, তখন দৃঢ়তার সহিত জিজ্ঞাসা করে—"সত্য কথা বলিয়া যাও, তুমি আসিবে কিনা?" "তবে যাবে যাও, একদিন আবার তুমি আসিবে, আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে"—দৃঢ়কণ্ঠে এই ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া দেয়। "তুমি আমারই, রোহিণীর নও"—এই জ্বলন্ত বিশ্বাস লইয়া ধীর পদক্ষেপে চলিয়া যায়—সে সময়ে তাহার গম্ভীরা মূর্ত্তি।

ভ্রমর মনস্বিনী, মহীয়সী নারী। গোবিন্দলাল যখন ভ্রমরের "ধর্ম্ম নাই কি?"— এই প্রশ্নের উত্তরে বলে "আমার বুঝি তাও নাই;" তখন ভ্রমর রাগও করিল না, যাইবার সময় চীৎকার করিয়া কাঁদিলও না, অত বড় আঘাতে ভূমিতে লুটাইয়াও পড়িল না। সময়ে, ধৈর্য্য-অভাবে যে বালিকাসম বুদ্ধিহীনা বিবেচিতা হইয়াছিল; সে-ই এখন সহিষ্ণুতার প্রতিমা বলিয়া গৌরব অর্জ্জন করিল।

রোহিণীকে হত্যা করিয়া গোবিন্দলাল ধরা পড়িলে পর ভ্রমরই পিতার নিকট কাঁদিয়া বলে, "বাবা যেমন ক'রে পার, বাঁচাও" অথচ তখনও সে স্বামীর সহিত একত্র বাস করিতে ইচ্ছুক নহে। দুঃখে লজ্জায় ভাবনায় স্বামীর পতনের জন্য নিজের জীবনের উপর এমনই দারুণ বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল, যাহারই ফলে তাহার শরীরে ক্ষয়-রোগ আসিয়া আশ্রয় করিল। দিনে দিনে, পলে

পলে ভ্রমর মরণের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। মরণের পূর্ব্বে পতি-দেবতার মন্দিরে—নিজের শয্যাগৃহে মরিবে বলিয়া ভ্রমর শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়া রহিল। ভ্রমর বড় গলা করিয়া বলে "আবার তুমি আসিবে, আবার তুমি ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে," কিন্তু মৃত্যুর দিন ত ঘনাইয়া আসিল, সে বাণী সফল হইল কৈ? পতির নিকট ক্ষমা না চাহিয়া, তাঁহার পদ-ধূলি মাথায় না লইয়া ভ্রমর কেমন করিয়া মরিবে? পতির মনের পরিবর্ত্তন না দেখিয়া গেলে সতীর অতৃপ্ত আত্মা মরণের পরেও যে হাহাকার করিয়া বেড়াইবে। পাপপথ হইতে পতিকে যদি ফিরাইতেই না পারা গেল, তবে এই কষ্টভোগ যে তাহার বৃথাই হয়।

মৃত্যুর দিন গোবিন্দলাল সসঙ্কোচে ধীরে ধীরে আসিয়া ভ্রমরের পার্শ্বে বসিলে সতী পতিপদধূলি মাথায় লইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। পত্নী সর্ব্ব সময়েই স্বামীর দাসী; স্বামীও পত্নীর দেবতা। দেবতাকে "ক্ষমা করিলাম" বলা দাসীর সাজে না। আর গোবিন্দলালও ভ্রমরের প্রকৃত ভক্তির পাত্র না হইয়াই বা কেমন করিয়া তাহার মুখে ক্ষমার কথা শুনিয়া যাইবে? ভ্রমরের মৃত্যুর পর অনুতাপে, কৃতকর্ম্মফল-ভোগে আর কঠোর সাধনায় গোবিন্দলাল যখন নিষ্পাপ ও পবিত্র হইয়া আসিল, তখনই ভ্রমরের প্রকৃত ক্ষমা ও ভক্তি লাভের যোগ্য হইল। আশীর্ব্বাদ করিও— "যেন জন্মান্তরে সুখী হই" ইহাই পতির নিকট ভ্রমরের শেষ ভিক্ষা। জন্মান্তরে ভ্রমর পতিরূপে গোবিন্দলালকেই অবশ্য মনে মনে চাহিয়াছিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া পতীকে এ কথা বলে নাই।

গোবিন্দলালের এই সৌভাগ্য তখনও আইসে নাই। এই অধিকারও জন্মে নাই, যাহাতে ভ্রমরের মুখে এই কথা গোবিন্দলাল শুনিয়া যায়। জীবনে বড় কষ্ট পাইয়া ভ্রমর "যেন সুখী হই" একথা বলিল বটে, কিন্তু স্বামী পাপের পথে যাইলে ত আর সে সুখী হইবে না—কাজেই পরোক্ষভাবে স্বামীর মঙ্গল কামনাই তাহার করা হইল।

ভ্রমর জীবনে যাহা করিয়া যাইতে পারে নাই, মরণের পরে তাহা সিদ্ধ করিল। ভ্রমরের প্রাণপাত সাধনাই গোবিন্দলালের জীবনে একটি অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আনয়ন করিল। ভ্রমর এই অভিমান-যুদ্ধে নিজের প্রাণটীকে আহুতি দিয়া যুদ্ধের প্রকৃত জয়লাভরূপ ফল পাইল। স্বামীকে যেমনটি দেখিতে চাহিয়াছিল, স্বর্গে থাকিয়া তাহা অপেক্ষা বড়ই দেখিতে পাইল। ইহ-জীবনেই দেবতাকে প্রকৃত দেবত্বে উপনীত করার জন্য সতীর এই কঠোর আত্মত্যাগ পুণ্যে সার্থক ও কল্যাণে চরিতার্থ হইয়া উঠিল।

রোহিণী চন্দ্রপত্নী রোহিণীর মতই সুন্দরী, ভোগসর্ব্বস্বা ও স্বার্থ-পরায়ণা। পুরাণে আছে, দক্ষের সাতাইশটী কন্যা চন্দ্রের সহিত পরিণীতা হয়, তন্মধ্যে রোহিণী জ্যেষ্ঠা ছিল। রোহিণীই রূপসৌন্দর্য্যে ও বুদ্ধি-কৌশলে চন্দ্রকে এমন ভাবে আয়ত্ত করিয়া রাখে যে, পিতামাতার করুণ প্রার্থনা ও ভগিনীদের কাতর নিবেদনেও অনুমাত্র টলে নাই। পিতার অভিশাপ-ফলে পতিকে ক্ষয়রোগগ্রস্ত দেখিয়াও রোহিণীর চৈতন্য জন্মে নাই। এমনই স্বার্থপর, এমনই ভোগসর্ব্বস্বা সে।

আমাদের রোহিণীও ধর্ম্ম, সমাজ, বিবেক ও কর্ত্তব্যের দিকে না চাহিয়া যে-ভাবে প্রণয়ীকে আয়ত্ত করে, সতীর বক্ষ হইতে

প্রণয়ীকে সবলে ছিনাইয়া লইয়া যেরূপে আপনার ভোগস্পৃহা চরিতার্থ করে—তাহাতেই তাহার রোহিণী নাম সার্থক হইয়াছে। তবে চন্দ্রপত্নী রোহিণী স্বার্থপরায়ণা এবং ভোগসর্ব্বস্বা হইলেও স্বর্গের দেবী। আমাদের রোহিণী স্বার্থ-পরায়ণা ও ভোগসর্ব্বস্বা, মর্ত্তের মানবী।

রোহিণী বালবিধবা। পতি কাহাকে বলে সে জানে না; যৌবনের মুকুল ফুটিবার পূর্ব্বেই বিধবা হইয়া পিতৃব্যের আশ্রয়ে আইসে। পিতৃব্য ব্রহ্মানন্দ বড় দরিদ্র; কাজেই রোহিণীকে একাই সংসারের সমস্ত কার্য্য করিতে হয়। অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী হইয়াও আজ বিশ্বের অনাদৃতা। একাকিনী "সে জল আনিতে যায়, সঙ্গিনী পায় না। দুঃখে তাহার সহানুভূতি করে, জগতে এমত কেহই তাহার ছিল না। আপনিই দুঃখ করে, কাহাকেও আপনার মর্ম্মের ব্যথা জানায় না। কোকিল "কু" "কু" করিয়া অতৃপ্ত যৌবন-লালসার স্মৃতি জাগাইয়া দিলে "মুখপোড়া দূর হ" বলিয়া গালিই দেয়, সহগুণ তাহার আদৌ ছিল না। "কোন্ পাপে আমার এই সাজা যে, এত সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী হইয়াও যৌবনে আমি দগ্ধপ্রায় হইতেছি, আর আমার অপেক্ষা শতগুণে কুৎসিতা ভ্রমর কোন্ পুণ্যে এত সুখৈশ্বর্য্যের অধিকারিণী," এইরূপে রোহিণী ঈর্ষ্যায় জ্বলিয়া মরিত।

রোহিণীর অনেক দোষ। ভোগলালসার অপূর্ণাবস্থায় বিধবা হইয়াছে বলিয়া সমাজের উপরও বিদ্বেষভাবাপন্না। অদৃষ্টের ফেরে সে বিধবা, ইহা মনে করিয়া সান্ত্বনা পাইত না। অদৃষ্টকে দেখিতে পাইলে তাহার সহিত সে বোঝাপড়া করিয়া লইত। বিধবার মত

সে সকল নিয়ম পালন করিত না ; কালাপেড়ে কাপড়ও পরিত, তাম্বুলরাগে ওষ্ঠাধর রঞ্জিতও করিত, কখনও কখনও নির্জ্জনে একাকিনী গুণ গুণ রবে দুঃখের গানও গাহিত।

হিন্দুর ঘরের বিধবা বলিয়াই যে তাহার বিবাহ হইতে পারে না, এ প্রকার ব্রহ্মচর্য্যশিক্ষা তাহার হয় নাই। সে শিক্ষা তাহাকে কেহ দেয়ও নাই। রোহিণী যেরূপ অপূর্ব্ব সুন্দরী ; পাশ্চাত্য দেশ হইলে, তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য রূপবান্ ধনী যুবকের অভাব হইত না। বিবাহ করিয়া সে ঘরণী গৃহিণী, সমাজের একজন হইতে পারিত, কিন্তু ভাগ্যে তাহার তাহা হইল না। বাধ্য হইয়াই তাহাকে অন্তরে অগ্নিশিখার মত ভোগাভিলাষ পুষিয়া রাখিয়া উপরে ব্রহ্মচারিণীর ভাণ করিতে হইল। দৃশ্যতঃ রোহিণী "প্রভাতশুক্ররূপিণী," প্রকৃত অগ্নিশিখার মতই সে জ্বালাময়ী ; হরিদ্রাগ্রামের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া কি দিবারাত্রি জ্বলিয়াই থাকিত।

কাহারও অন্তরে অনুরাগের সঞ্চার অগ্রে হয়, ভোগলালসা পরে জন্মে। কাহারও অন্তরে বা ভোগলালসা জাগিয়াই থাকে, সুপুরুষ-সংস্পর্শ ঘটিবামাত্র অনুরাগটি ফুটিয়া উঠে। হরলালের উপরেও রোহিণীর ভালবাসা প্রথম পড়ে নাই, ভোগলালসার তৃপ্তির জন্যই সে তাহার পত্নীত্বের অভিলাষ করিয়াছিল মাত্র। সেই জন্যই সে কৃষ্ণকান্তের দেরাজ-মধ্যে জাল উইল রাখিয়া প্রকৃত উইল চুরি করিয়া আনিতে কুণ্ঠিতা হয় নাই। অবশ্য বিপদ হইতে উদ্ধারকারী বলিয়া হরলালের উপর রোহিণীর হৃদয়ে সামান্য কৃতজ্ঞতা ও কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধার ভাব পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান ছিল। গোবিন্দলালের দেবনিন্দিত কান্তি দেখিয়া এবং তাহার দয়াপ্রাণতার

পরিচয় পাইয়া তাহার ভোগলালসাময় হৃদয়ে প্রকৃতপক্ষে অনুরাগের সঞ্চার হয় ; পরে তাহাই কামমোহময় হইয়া তীব্র-ভোগ-লালসা-রূপে বিবর্ত্তিত হয়।

গোবিন্দলাল সচ্চরিত্র পুরুষ, তাহার প্রেয়সী পত্নী—সহধর্ম্মিনী বিদ্যমান। সে প্রেয়সী আবার ভ্রমরের মত। রোহিণীর আশা পূর্ণ হইবার নহে। তার উপর ভ্রমর বলিয়া পাঠাইয়াছে "গলায় কলসী বাঁধিয়া পুষ্করিণীর জলে ডুবিয়া মর।" তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুকাইয়া আছে, সম্মুখে সুশীতল জলপূর্ণ সরোবর, সেই জলপানে রোহিণীর কোন অধিকারই নাই। রাত্রি দিন, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে দগ্ধ হইয়া মরার চেয়ে একেবারেই মরা ভাল বুঝিয়া, সে ডুবিয়া মরাই তখন সাব্যস্ত করিল। তার উপর ভ্রমর গোবিন্দ-লালেরই সম্মুখে দাসীর দ্বারা তাহাকে ডুবিয়া মরিবার পরামর্শ দিয়াছে। ক্ষোভে, নৈরাশ্যে, লজ্জায়, অপমানে, রাগে, ঈর্ষায় রোহিণী পুষ্করিণীর জলে ডুবিল।

গোবিন্দলাল তাহাকে বাঁচাইল। ভালবাসার যে তুষাগ্নিতে রোহিণী দিবারাত্রি পুড়িতেছে, আজ যে মুখ ফুটিয়া তাহা বলিবার অবসর পাইল, ইহাতেই সে তৃপ্তা হইল। প্রাণের ভার লঘু করিতে পাইল, ইহাতেই সে কৃতার্থা হইল। রূপজ অনুরাগ ও গুণজ অনুরাগের সহিত জীবনদাতার প্রতি একটি গভীর কৃতজ্ঞতাজনিত অনুরাগ আসিয়া মিশিল। ত্রিবিধ অনুরাগ এক অনুরাগেরই পৃথক্ মূর্ত্তি। এদিকে, গভীর রাত্রে গোবিন্দলালের উদ্যানবাটী হইতে রোহিণীকে ফিরিতে দেখিয়া লোকে কানাঘুষা করিতে লাগিল। গোবিন্দলালের অনুপস্থিতির সুযোগ পাইয়া লোকে

মনের সাধে কলঙ্কের ঢাক বাজাইল। রোহিণী দেখিল, তৃষ্ণাও মিটিল না, কণ্ঠও ভিজিল না, কলঙ্কের কর্দ্দম মাখাই কেবল সার হইল। ভ্রমরই এই কলঙ্ক-রটনা করিয়াছে—মনে মনে এই সিদ্ধান্ত করিয়া রোহিণী গায়ের ঝাল মিটাইবার জন্য ভ্রমরকে গোবিন্দলাল-প্রদত্ত অলঙ্কারদানের গল্প বলিয়া আসিল।

রোহিণী যাহা চাহে, তাহা সে পাইল। দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষাই তার মূর্ত্তিমতী বরদাত্রী হইয়া আসিয়াছে, রোহিণী গোবিন্দ-লালের সহিত দেশত্যাগিনী হইল। গোবিন্দলালকে রোহিণী প্রকৃত ভালবাসা বাসে নাই, নিজের আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় এবং কামমোহের প্রেরণাতেই তাহার সহিত মিলিতা হইয়াছে ও বসবাস করিয়াছে। তাহা না হইলে রাসবিহারীকে দেখিবামাত্র তাহাকে কটাক্ষবাণে আহত করিবার প্রবৃত্তি তাহার জাগিবে কেন? প্রথম আলাপ মাত্রই "তোমাকে ভুলিতে পারি নাই বলিয়া এখানে আসিয়াছি" এ প্রগল্‌ভা বেশ্যার বাণী তাহার মুখে ফুটিবে কেন?

সতীত্ব অমূল্য রত্ন। সে রত্ন যে হারাইয়াছে, সে শূকরী অপেক্ষা অধমা। চরিত্রের বন্ধন একবার কাটিয়া গেলে, তাহার প্রবৃত্তি এইরূপই নীচ হয়—ইহাই প্রকৃতির ধর্ম্ম। গোবিন্দলাল যখন গৃহমধ্যে পিস্তল লইয়া রোহিণীকে মারিবার জন্য উদ্যত, তখনও পদাঘাত খাইয়া রোহিণী সকাতরে বলিতেছে, "আমাকে মারিও না,* আমার নবীন বয়স * * * *।" মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাতর হওয়া অবশ্য অস্বাভাবিক নহে; কিন্তু "আমার নবীন বয়স"—

* প্রকৃত নাম নিশানাথ।

এই বলিয়া দয়া ভিক্ষা করার মধ্যে তাহার এমন একটি ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে—যাহা রোহিণীর ভিতরকারই প্রকৃত মূর্ত্তি বলা যায়। এইরূপ মৃত্যুই রোহিণীর উপযুক্ত দণ্ড।

ভ্রমরের আত্মা স্বর্গে সতীকুঞ্জে চলিয়া গেল। রোহিণীর আত্মা নরকের অন্ধকূপে গিয়া আশ্রয় লইল। ভ্রমরের জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত সকলের আদরণীয়া হইল। রোহিণীর মসীময়ী মূর্ত্তি ঘৃণা ও পাপের জলন্ত সাক্ষীরূপে লোকসমাজেও নিন্দিতা রহিল।

তিলোত্তমা ও আয়েষা।

তিলোত্তমা ও আয়েষা প্রণয়ের দুইটী আদর্শ মূর্ত্তি। দুই-ই সুন্দর, দুই-ই আকাঙ্ক্ষিত। তিলোত্তমা সরস্বতীর মত মৃদুস্রোতা। আয়েষা যমুনার মত স্রোতঃস্বতী। তিলোত্তমা পল্লীশ্রী; আয়েষা রাজলক্ষ্মী। প্রথমটি—স্ফুটনোন্মুখী নবমল্লিকা, দ্বিতীয়টি—পূর্ণ-প্রস্ফুটিত শতদল। একটি পূর্ণচন্দ্রের বিমল প্রভা, অন্যটি বাল-সূর্য্যের নির্ম্মল রশ্মি। এটি স্বপ্নের ফুল, ওটি আরাধনার ফল। এটি আবেশ, ওটী সুখ। শিরীষ-সুকুমারা তিলোত্তমা আদরের বস্তু। জ্যোতির্ম্ময়ী আয়েষা স্পর্শের সামগ্রী। তিলোত্তমা বুদ্বুদের মত ফুটে, আয়েষা উৎসের মত ছুটে।

তিলোত্তমা।

তিলোত্তমা নামটী সার্থক। বিশ্বের সমগ্র সৌন্দর্য্যের তিল তিল আহরণে তবে এই উত্তম মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ। কবির সৃষ্ট এই চিত্র বিধাতার প্রথম সৃষ্টিরূপে উদ্ভাসিতা তিলোত্তমার স্মৃতি জাগাইয়া দেয়। সৌন্দর্য্যের মানসী প্রতিমা স্বর্গে অপ্সরার দলে থাকিয়া স্বর্ব্বেশ্যা হইতে না চাহিয়াই যেন মর্ত্তের মানবী হইয়া নামিয়া আসিয়াছে। অঙ্গে পারিজাতের অম্লান সৌরভ, নেত্রে নন্দন-নিকুঞ্জের স্নিগ্ধ কোমল শোভা, আলাপে ত্রিতন্ত্রীর মৃদুল ঝঙ্কার, স্পর্শে মলয়ের মধুর শিহরণ। ইহার ছায়া-তরল মৌন সৌন্দর্য্য যেন এ পৃথিবীর নহে।

অলঙ্কার-শাস্ত্রের নিয়মে তিলোত্তমা "সমধিক-লজ্জাবতী"—"প্রথমাবতীর্ণ-যৌবন-মদনবিকারা"—"মুগ্ধা" নায়িকা।

প্রথমাবতীর্ণ-যৌবন-মদনবিকারা, রতৌ বামা।
কথিতা মৃদুশ্চ মানে সমধিকলজ্জাবতী মুগ্ধা॥
—সাহিত্যদর্পণ। ৩য় পরিচ্ছেদ।

তিলোত্তমা ষোড়শী—প্রথম যৌবনাবির্ভাবে রমণীয়া। দৃশ্যতঃ কিশোরী ; মুখের শ্রীটি বালিকার মত। অভিমানে অতি-মৃদু, প্রণয়ে নিরভিমানিনী।

প্রণয়ে নিরভিমানিনী সতীনারী সংসারে দুর্লভ। পাশ্চাত্য সাহিত্যেও নিরভিমানিনী সতীনারীর আদর্শ আছে। দেস্‌দিমনাই সেই আদর্শ। দেস্‌দিমনা পিতার অভিশাপের তীব্র দাহে কোমল কুসুমের মত অকালে শুকাইয়া গেল। তিলোত্তমা রাহুগ্রস্ত চন্দ্র কলার মত কালের গ্রাস হইতে বাঁচিয়া গেল। নিরভিমানিতা যে আদর্শ প্রণয়ের লক্ষণ—ইহা কবির নিজেরই উক্তি। প্রেমাস্পদের সুখই যে স্থলে কাঙ্ক্ষিত, আপন স্বার্থ যে স্থানে বিসর্জ্জিত, নিরভিমানিতা সেই স্থলেই সম্ভব। আত্মদানেই প্রকৃত আত্মবিসর্জ্জন ও আত্মত্যাগের ভাব ফুটিয়া থাকে।

অভিমান সাধারণত প্রণয়েরই লক্ষণ। ইহারও দুইটী দিক্ আছে। আদর্শও দুই প্রকার ; প্রণয় যেখানে যত প্রবল, অভিমানের জোরও সেখানে তত অধিক। প্রণয়ী তেমন ভালবাসিল না, তেমন আদর করিল না, সে গদগদ, সে আত্মহারা ভাব দেখাইল না—অমনই অভিমান। মতে মত মিলিল না, আচরণে উপেক্ষা, স্নেহাভাব ও ঔদাসীন্য

প্রকাশ পাইল—অমনই অভিমান! অন্যাসক্তি—সে ত সহ্যের অতীত।

তিলোত্তমার সৌন্দর্য্য বাসন্তী-মল্লিকার মত নবস্ফুট, ব্রীড়া-সঙ্কুচিত, কোমল ও পরিমলময়; তাই তাহার প্রেমও চন্দ্রকিরণের মত শীতল, কোমল ও মনোমদ। তাই সে প্রেমে মাধুর্য্য আছে, কিন্তু দাহ নাই। আবেশ আছে, কিন্তু উন্মত্ততা নাই। মগ্ন প্রেমের বিপুল আত্মবিস্মরণ আছে, অথচ প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসময় কলকল ধ্বনি একেবারে নাই।

তিলোত্তমা একাধারে বালিকা, কিশোরী এবং নবীনা যুবতী। প্রকৃতি তাহার বড় কোমল, বড় সরল। শিক্ষা, সংসর্গ এবং গ্রন্থাধ্যয়নে সে কোমলতা, সে সরলতা বিন্দুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। বয়সের ধর্ম্মে যৌবনসুলভ চাতুর্য্য ও কোটিল্য কিছুমাত্র জন্মে নাই। অঙ্গে সঙ্গে যৌবনের শ্যামোজ্জ্বল শোভা বিকসিত। মুখখানি বালিকার মতই নির্ম্মল ও সুকুমার। প্রকৃতির কোমলতায় "অভিজ্ঞানশকুন্তলের" অনসূয়া, বৃত্রসংহারের ইন্দুবালা, বিষবৃক্ষের কুন্দনন্দিনী, এবং সীতারামের রমার মধ্যে তিলোত্তমার ভাবসাদৃশ্য পাওয়া যায়। সরমে কুণ্ঠিতা, ভয়ে আত্মহারা, মিলন-সুখে বিবশা, প্রণয়ে নিরভিমানিনী, বিরহে জীবন্মৃতা—তিলোত্তমার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য অপর কাহাতে নাই।

"প্রথমাবতীর্ণযৌবনমদনবিকারা," নবপ্রণয়বতীমুগ্ধা তিলোত্তমার প্রণয়ে সংযমের আশা করাই বৃথা। প্রথম-দর্শনেই যে অবগুণ্ঠনের কিয়দংশ অপসৃত করিয়া জগৎসিংহের প্রতি অনিমেষ লোচনে চাহিয়াছিল, না ভাবিয়া না চিন্তিয়া একেবারে

মন প্রাণ নিবেদন করিয়া দিয়া আত্মহারার মত ভাল বাসিয়াছিল, ক্ষণেকের মিলনেই অদর্শনাশঙ্কায় আপনা-ভোলা হইয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিয়াছিল, মরণের কোলে একেবারে ঢলিয়া পড়িয়াও তথাপি যে জগৎসিংহ-গতপ্রাণা হইয়া সেই চিন্তাতেই নিমগ্না ছিল ;—তাহার কাছে আয়েষার সে চিত্ত-বলের আশা করাই বৃথা। অনুরাগের আকর্ষণে, ভাবের স্রোতে এবং হৃদয়ের টানে অঙ্গ ভাসাইয়া দিয়া বহিয়া যাওয়া—একজাতীয় নারীপ্রকৃতিরই ধর্ম্ম। তিলোত্তমা সেইজাতীয় নারী।

তিলোত্তমার প্রেম কতকটা রূপজ এবং কতকটা অহেতুক। কবিগণ রূপজ প্রেমকে মদনশরজ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অহেতুক প্রেম ভবভূতির ভাষায় "চক্ষুরাগ" বা "তারামৈত্রক" নামে অভিহিত হইয়াছে। কোমলহৃদয়া ও ভাবময়ী বলিয়াই তিলোত্তমা প্রথম-প্রণয়েই এত বিহ্বলা এত অধীরা।

তিলোত্তমার রূপালোক বালেন্দু-জ্যোতির মত সুবিমল, সুমধুর ও সুশীতল। সে রূপালোক লইয়া প্রেমের খেলা যেমন চলে, গৃহের গৃহিণীপনা তেমন চলে না। তাহার কৃষ্ণতার চক্ষুদুটি যেমন স্নিগ্ধ, তেমনই শান্ত। সে চক্ষুতে যৌবনসুলভ চাপল্য বা চাতুর্য্য ছিল না, ক্ষণেক্ষণে চকিত বিবর্ত্তিত কটাক্ষ খেলিত না ; হাব, ভাব, বিলাস, বিভ্রম বা ভ্রূভঙ্গী দেখাই যাইত না। সান্ধ্য আকাশের মতই তাহা সুন্দর। দৃষ্টিটি এমন, তাহাতে বিমল স্নেহরূপ অমৃতধারা ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িত। তাহার গতি স্থির, গজেন্দ্রগতির সহিত উপমা দেওয়া চলে না। তন্বী বলিয়াই গজেন্দ্রগমনা নহে। নবানুরাগের

স্পর্শ ঘটিবা মাত্র তাহার সুকুমার হৃদয় একেবারে আর্দ্রকোমল হইয়া গেল। মদনের শর অবসর বুঝিয়া তীক্ষ্ণ লৌহশলাকার মত তাহার মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিল। এত সরলা—ভালবাসিবার পূর্ব্বে ন্যায় অন্যায় সম্ভব অসম্ভব কোনরূপ বিচারই করিল না। এমত বালিকা—লতাপাতা লিখিতে আরম্ভ করে। এইরূপ বিহ্বলা—জগৎসিংহের নাম লিখিয়া বসে। তিলোত্তমা এখন লুকাইয়া গীতগোবিন্দ পুস্তকখানি পড়ে, আবার লজ্জায় পুস্তকখানি ছুড়িয়া ফেলিয়াও দেয়। তাহার প্রাণটি বড় কোমল—কাজেই ভয়াতুর। মোগল-আক্রমণের সংবাদ শ্রবণ-মাত্র তাই সে চীৎকার করিয়া পালঙ্কের উপর একেবারেই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। বড় ভাবময়ী সে, বীণার ছড়ির মত প্রিয়তমের কণ্ঠলগ্না হইয়া থাকিতেই ভালবাসে; ভেরীধ্বনির মত বীরের উৎসাহ বর্দ্ধন করা পছন্দ করে না। যুদ্ধের শেষে সে শান্তি, শ্রমাবসানে সে বিশ্রান্তি; বটে, কিন্তু বীরত্বের সহায়রূপা নহে বা সংসারের কর্ম্মসঙ্গিনী নহে। রাজপুতনার বীরনারী বাঙ্গালার জল-বাতাসের গুণে বাঙ্গালীর মেয়ে হইয়াই দাঁড়াইয়াছে।

আয়েষা।

আয়েষা স্বর্গলোকের দেবী। সতীকুঞ্জের সম্রাজ্ঞী। দেবীর করুণা, সম্রাজ্ঞীর ভাব, দুইই তাহাতে বর্ত্তমান। সেই উন্নত আকার, সেই সুপরিপুষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সেই নব-সূর্য্যকরোজ্জ্বল বর্ণ, সেই মহিমময় পদবিন্যাস সম্রাজ্ঞীরই উপযুক্ত। সেই সেবা,

সেই আত্মসম্মান, সেই ত্যাগ স্বর্গদেবীর স্মৃতিই জাগাইয়া তুলে।

অলঙ্কারশাস্ত্রের অনুশাসনে আয়েষা "মধ্যা" শ্রেণীর নায়িকা। "প্ররূঢ়স্মরযৌবনা", "ঈষৎ প্রগল্ভবচনা" "মধ্যমব্রীড়িতা" নারীই "মধ্যা"। তিলোত্তমার মত আয়েষা পূর্ণ প্রস্ফুটিতা; নব প্রস্ফুটিতা নহে। দ্বাবিংশতি বৎসরেরই পরিপূর্ণ সে যৌবনা। আয়েষার আলাপ বীণাধ্বনিবৎ সুস্পষ্ট, কিন্তু স্থানবিশেষে ঈষৎ প্রগল্ভ। আয়েষা না—নির্লজ্জা না—তিলোত্তমাবৎ সমধিক-লজ্জাবতী।

আয়েষার সৌন্দর্য্য নব-রবিকর-ফুল্ল জল-নলিনীর ন্যায় সুবিকসিত, সুবাসিত ও রসপরিপূর্ণ; কোমল অথচ উজ্জ্বল। তাহার রূপ ভুবনমনোমোহন, পূর্ব্বাহ্নের সূর্য্যরশ্মির ন্যায় প্রদীপ্ত, ও প্রভাময়। যাহাতে পড়ে, তাহাই যেন হাসিতে থাকে। রাজ্যোদ্যানের বসোরা গোলাপ; ধ্যানলভ্যা আরাধ্যা মূর্ত্তি। প্রথম দর্শনেই আয়েষা জগৎসিংহের নিকট দেবকন্যাবৎ প্রতীতা হইয়াছিল। জগৎসিংহ যখন আয়েষার বায়ু-কম্পিত নীলোৎপলদল-তুল্য কটাক্ষের প্রতি একদৃষ্টে চাহিত, আয়েষার হৃদয় তৃপ্ত হইত। আয়েষার লীলাময় সঙ্গীতমধুর পদবিন্যাস, বিদ্যুদগ্নিপূর্ণ মেঘবৎ চঞ্চল হাসি আর লাবণ্যময় গ্রীবাভঙ্গী আয়েষারই উপযুক্ত। তাহার অন্তঃকরণটি কুসুমের মত কোমল ছিল। প্রয়োজন হইলে বজ্রবৎ কঠোর হইত। তরুর মত সহিষ্ণু; আঘাত পাইলে অসহিষ্ণু হইত। স্বভাবতঃ করুণাময়ী; বিরক্ত কর, দেখিবে, জ্বালাময়ী বিদ্যুৎশিখা।

ঘটে, এমনও পরিবর্ত্তন হয় পূর্ব্বের সহিত কোন সাদৃশ্যই থাকে না। আলোকময়ী শ্রী আঁধারময়ী হইয়া উঠে। তিলোত্তমাও তখন আর সে হাস্যময়ী বালিকা নাই বা লজ্জাশীলা প্রণয়িনী নাই। দেখিলে বোধ হয়, তাহার দশ বৎসর বয়স বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কতলুখাঁর জন্মদিনোৎসবে যোগ দিবার জন্য বিমলা বেশ-বিন্যাস করিয়া তিলোত্তমার কক্ষে আসিয়াছে। সে সাজ সজ্জা তিলোত্তমা সহ্য করিতে পারিল না, কহিল "তবে মা এ সকল অলঙ্কার খুলিয়া ফেল। আমার চক্ষুশূল হইয়াছ।" তিলোত্তমার এ করুণচিত্র কুমারসম্ভবের পতিবিয়োগ কাতরা রতির অবস্থা স্মরণ করাইয়া দেয়।

গত এব ন তে নিবর্ত্ততে স সখা দীপইবানিলাহতঃ।
অহমস্য দশেব পশ্য মামবিসহ্য-ব্যসনেন ধূমিতাং॥

প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে। তিলোত্তমা ধূমাচ্ছন্না দীপশিখার মত মুহ্যমানা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

বিমলা পতির অন্তিম ইচ্ছা পালনের জন্যই আজ রূপের ফাঁদ পাতিয়াছে। পতিহন্তাকে দণ্ড দিবার জন্যই বেশ্যার সাজে সাজিয়াছে। পতির স্বর্গগত আত্মার তৃপ্তিসাধন উদ্দেশ্যে শত্রুর রক্তধারায় তর্পণ করিয়া বিমলা সুস্থ মনে ওসমান্-প্রদত্ত মুক্তিঅঙ্গুরী সাহায্যে তিলোত্তমাকে এ রাক্ষসী পুরী ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিল, অভিরাম স্বামীর কুটীরে যাইয়া অপেক্ষা করিতে বলিল। বিমলার পিতা তিলোত্তমার মাতামহ।

অভিরাম স্বামী বনের মধ্যে কুটীর বাঁধিয়া আছেন। তাঁহারই প্রেরিতা হইয়া "আসমানী" দাসী-রূপে নবাবের অন্তঃপুরে প্রবেশ

করিয়াছিল। স্বামীজি সেই "আসমানী"র দ্বারাই বিমলার সহিত সংবাদ আদান প্রদান করিতেন।

তিলোত্তমার বড় সাধ, জানিয়া লয়—রাজপুত্র কি অবস্থায় আছেন। মায়ের কাছে (বিমাতা) প্রকারান্তরে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াও লইল—জগৎসিংহ দুর্গ মধ্যেই আছেন এবং শারীরিক ভালই আছেন। তখন তিলোত্তমা বাষ্পাকুললোচনা হইয়া ভাবিতে বসিল "রাজপুত্র আমার জন্য কারাগারে বন্দী। কেমন সে কারাগার! আচ্ছা, এ অঙ্গুরী দ্বারা তাঁহার উদ্ধারের কৌশল করা যায় না?, একবার তাঁহার সাক্ষাৎ মেলে না?" ইহা কিরূপে সম্ভব হইবে, ইহাতে পরিণামে নিজেরই বা কি অবস্থা হইবে, সে ভাবনাও নাই। প্রেমাস্পদকে বাঁচাইতে পারিলেই প্রকৃত প্রণয়িনীর তৃপ্তি। ইহাই যে প্রকৃত ভালবাসা। আপনার সুখের চেয়ে প্রেমাস্পদের সুখই যেখানে অধিক আকাঙ্ক্ষিত, প্রকৃত ভালবাসা সেই খানেই।

তিলোত্তমা অঙ্গুরী লইয়া—পা কাঁপে, মুখ শুকায়—তবু চলিতে লাগিল। প্রহরীদের "কোথায় লইয়া যাইব" এই কথার উত্তরে কোনরূপে অর্দ্ধস্ফুট "জগৎসিংহ" কথাটি মাত্র উচ্চারণ করিল। তখন প্রহরীর পশ্চাতে যন্ত্রচালিতা পুত্তলিকার মত সে কারাগারদ্বারে আসিয়া পৌছিল। পা আর সরে না। একবার মনে করিল ফিরিয়া যাই, কিন্তু ফিরিতেও পা উঠে না। তখন শৈলদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তিনী তটিনীর মত তিলোত্তমার "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থা।

জগৎসিংহের নয়নে নয়ন মিলিল। কই, নয়নে ত পূর্ব্বের মত অনুরাগের মৃদুল হিল্লোল খেলিল না! কোনও ভাব নাই।

আয়েষা তিলোত্তমার মত জগৎসিংহকে দেখিবামাত্র ভালবাসে নাই। জগৎসিংহের রূপ-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্টা হইয়া একেবারেই প্রাণ মন নিবেদন করিয়া বসে নাই। এই ভালবাসা একক্ষণে বা একদিনে জন্মে নাই। এ ভালবাসা ধীরে ধীরে, একটু একটু করিয়াই আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ছদ্মবেশে গোপনে প্রবেশ করিয়া একদিন সহসা আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিল। বন্দীর প্রতি করুণা, মুমূর্ষুর প্রতি সহানুভূতি, ব্যথিতের প্রতি সান্ত্বনা, ক্রমে ক্রমে অতর্কিতে ভালবাসায় পরিণত হইতে লাগিল। আয়েষা জানিত, পীড়িতকে সেবা করা, ব্যথিতকে সান্ত্বনা দেওয়া, বিপদাপন্নকে সাহায্য করা রমণীর ধর্ম্ম। ওসমানের অনুরোধে পড়িয়া স্বেচ্ছায় আয়েষা রোগীর ভার গ্রহণ করে। করুণা ও সমবেদনা পাইয়া তাহার নারীহৃদয় দিনে দিনে এমনই দ্রবীভূত হইল, যাহাতে দেবকান্তি রাজপুত্রের সুপুরুষসংস্পর্শ সহজেই সে হৃদয়ে নব অনুরাগের ভাব জন্মাইয়া দিল। মৃত্যুর কোলে শুইয়া জগৎসিংহ যখন সান্ত্বনার মত আয়েষাকে জড়াইয়া ধরিত, আয়েষার চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া যাইত। বড় আগ্রহে, তীব্র রোগযন্ত্রণায় কাতর রাজপুত্র যখন আয়েষার কর দুটি বেড়িয়া ধরিত, আয়েষার নারীহৃদয় কাঁপিয়া উঠিত; যৌবনের বৃত্তিগুলি অবসর পাইয়া জাগিয়া উঠিত। এইরূপে পলে পলে দিবা রাত্রি বিস্ফারিত দৃষ্টির দ্বারা আয়েষা রাজকুমারের রূপ-মদিরা পান করিতে লাগিল। আয়েষার মন সেই মদিরা-পানে তাহার অজ্ঞাতসারেই ভিতরে ভিতরে বিহ্বল হইয়া উঠিল। স্নানের সময় উত্তীর্ণ না

হইলে আর স্নান করিতে যাওয়া ঘটিত না। মাতার নিকট তাড়া না আসিলে আর পীড়িতের সান্নিধ্য ত্যাগ করা হইত না।

আয়েষা প্রতিদানের আশা না করিয়াই ভালবাসিয়াছিল। জানিয়া শুনিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া সে ভালবাসে নাই। নতুবা যেখানে মিলনের আশা নাই, সেখানে বুদ্ধিমতী হইয়া কেন ভালবাসিবে? আয়েষা ইচ্ছা করিয়া, সাধ করিয়া ত আর সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি দিতে অগ্রসর হয় নাই। অজ্ঞেয় আকর্ষণে সে অবশ হইয়া প্রখর স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে।

আয়েষা ভাবময়ী অথচ কর্ম্মময়ী। সে যেমন বীণার ছড়ির মত কণ্ঠে থাকার যোগ্য হইয়াছে, তেমনই ভেরী-ধ্বনির মত বীরের উৎসাহ বাড়াইয়াছে। আয়েষা যুদ্ধাবসানে শান্তি, যুদ্ধাবির্ভাবে উত্তেজনা। প্রেমে ভাবময়ী, সংসারে কর্ম্মময়ী। গৃহে গৃহলক্ষ্মী, রাজ্যে রাজলক্ষ্মী, সংগ্রামে বিজয়লক্ষ্মী।

তিলোত্তমা।

যে তিলোত্তমা পিতৃগৃহে নবমল্লিকার মত মন্দবায়ু-হিল্লোলে নাচিতে নাচিতে খেলিয়া বেড়াইত, আজ সে কতলুখাঁর গৃহে বন্দিনী। নৈদাঘঝটিকায় আশ্রয়তরুচ্যুতা ভূতলশায়িতা লতার অবস্থায় উপনীতা। মুখের সে জ্যোৎস্না-মধুর হাসি করুণ ক্রন্দনে পর্য্যবসিত, চক্ষুর সে ধীর স্নিগ্ধ দৃষ্টি নিরাশ্র এবং বেদনার ভারে অবনমিত। কোমলপ্রাণা বালা কাঁদিয়া কাঁদিয়া শয্যায় অবসন্নভাবে পড়িয়া আছে।

দুঃখে পড়িলে মানুষের অনেক শিক্ষা হয়, নানারূপ পরিবর্ত্তন

এদিকে জগৎসিংহ যে তিলোত্তমার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়া তাহার প্রতি বিগতস্পৃহ অভাগী তাহা জানিবে কিরূপে, শূণ্য হৃদয়ে তখন তিলোত্তমা আপনাকে ঠিক রাখিতে না পারিয়া কাঁপিয়া উঠিয়া বেতস লতার মত সম্মুখে ঢলিয়া পড়িবার মত হইল। জগৎসিংহ পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইলে, অমনই তিলোত্তমার অবশ দেহলতা ইন্দ্রজালশক্তি-রুদ্ধবৎ হইয়া স্তম্ভিত হইল। হৃৎপদ্মটি ক্ষণ-প্রস্ফুটিত হইয়া শুকাইয়া গেল।

"বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা"—কি নিষ্প্রণয় সম্বোধন! "এখানে কি অভিপ্রায়ে"—কি উপেক্ষাময় মর্ম্মান্তিক ব্যবহার! তিলোত্তমার মাথা ঘুরিল। কক্ষ, প্রাচীর, শয্যা, প্রদীপ যেন ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তিলোত্তমার বাক্‌শক্তি তখন লুপ্ত, ইন্দ্রিয় অসাড়, চিত্ত বিমূঢ়। সে কথার উত্তর দিবে কি? এ যে জাগরণে স্বপ্ন! এ কি সত্য, না—ভ্রান্তি?

তারপর তিলোত্তমা জগৎসিংহের মুখে শুনিল "তুমি ফিরিয়া যাও, পূর্ব্ব কথা বিস্মৃত হও"। স্বপ্ন তখন আর স্বপ্নমত বোধ হইল না, ভ্রম আর ভ্রম রহিল না। স্বপ্ন বাস্তব হইয়া দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গে তিলোত্তমা বৃক্ষচ্যুত বল্লীবৎ বীতসংজ্ঞ হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

ভবভূতির সীতা পতি-কর্ত্তৃক বিসর্জ্জিতা হইয়া দুঃখ শোক সহিতে না পারিয়া সজ্ঞানে গঙ্গা-গর্ভে ঝাঁপ দেন; আর তিলোত্তমা মানসিক বেদনার ভারে বিগতচেতনা হইয়া অজ্ঞানে ধরার বক্ষে লুটাইয়া পড়িল। কালিদাসের শকুন্তলা আহতা বীর নারীর মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া পরক্ষণে চক্ষুজলে বক্ষ ভাসাইয়া

দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৌতমীর পশ্চাতে ছুটিয়া যায়। তিলোত্তমা চলিয়া পড়িল না বা ছুটিয়া গেল না; অন্তরের শোকভার রোদনে কিছুমাত্র উপশমিত হইল না। সীতা শরীরিণী বিরহ ব্যথার মত, শকুন্তলা "নিয়ম-ক্ষামমুখী" ব্রহ্মচারিণীর মত অবসন্ন প্রাণটি ধরিয়া রাখিয়াছিল। তিলোত্তমা কিন্তু সে অবিসহ দুঃখ শোক সহ্য করিয়া প্রাণটিকে কোনও মতে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। তিলোত্তমা মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িবার মত হইয়াও বহ্নিতাপে অর্দ্ধদগ্ধা লতার মত কোনও রূপে মুমূর্ষু প্রাণটিকে লইয়া জীবনমরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া রহিল।

তিলোত্তমার আপনাহারা প্রগাঢ় প্রণয়ের ফল ফলিল। কতলূখাঁর মৃত্যুকালীন উক্তি শুনিয়া জগৎসিংহের সন্দেহ ছুটিয়া গেল। সংশয়ের মেঘ অপসৃত হইল; প্রণয়ের জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি জীবন্ত হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। জগৎসিংহও তিলোত্তমার পার্শ্বে আসিয়া বসিল। প্রণয়-বারিসেকে বহ্নিদগ্ধা লতা বাঁচিয়া উঠিল। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখাটি তৈলবিন্দু পাইয়া হাসিয়া উঠিল।

প্রণয়ই পরম রসায়ণ, মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র। মনের উৎকট যন্ত্রণায় যে রোগের সৃষ্টি, বাহিরের গাছ গাছড়ার ঔষধে তার কি করিবে? কুমার জগৎসিংহ আসিয়াছেন শুনিয়া তিলোত্তমা কি করিল? তিলোত্তমা শুধু নয়নপথ নিমীলিত করিয়া একদৃষ্টে জগৎসিংহের প্রতি চাহিয়াই রহিল। সে দৃষ্টি কেমন? কোমল ও স্নেহময়, তিরস্কারের কোন চিহ্নই তাহাতে নাই। কবি বলিয়াছেন—"তিরস্কারাভিলাষের চিহ্নমাত্র বর্জ্জিত।"

অমর কবিরই উক্তি—"নিরভিমানিতা আদর্শ প্রণয়ের

লক্ষণ।” তিলোত্তমার প্রণয়ে সাধারণতঃ অভিমান ছিল না। তাহার এ প্রণয় অভিমানশূন্য ; নিস্তরঙ্গ হ্রদের মত স্থির, নবনীতের মত কোমল। তবে তিলোত্তমার মুমূর্ষু অবস্থাটি “তিরস্করণের চিহ্ন মাত্র বর্জ্জিত” ভাবটি যদি একরূপ নূতন অভিমান বলিয়া ধরা যায়, তবে ঐ অভিমান তাহার ছিল। তিলোত্তমার নিরভিমানিতা সাধারণ অভিমান নহে।

তিলোত্তমা ভালবাসার ক্রীড়নী,—খেলিবার সামগ্রী। তাহার প্রেমপ্রতিম মুখখানি সংসারের সকল জ্বালা যন্ত্রণা ভুলাইয়া দেয়। কর্ম্মজগতে সে প্রকৃত কর্ম্মময়ী হইয়া আইসে নাই। এ যে কবিতার রাণী, স্বপ্নের ছবি, হৃদয়ের বিশ্রামভূমি। প্রকৃতির সরলতা নানা গ্রন্থ-অধ্যায়নে কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। আয়েষায় নিকট সে বালিকা মাত্র। বহুমূল্য অলঙ্কারে তিলোত্তমাকে মনোমত সাজাইয়া আয়েষা যখন বলিয়াছিল—

“তুমি যে রত্ন হৃদয়ে ধারণ করিলে, এ সকল তাঁর চরণরেণুর তুল্য নহে”—এই কথার প্রকৃত অর্থ তিলোত্তমা তিলমাত্র বুঝিতে পারে নাই। “* * * আর আমার—তোমার সার রত্ন” বলিতে বলিতে আয়েষার যখন কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, তখনও তিলোত্তমা বুঝিতে পারিল না। আয়েষার নয়নপল্লব জলভারস্তম্ভিত হইয়া কেবল কাঁপিতেছিল দেখিয়া তিলোত্তমা সমদুঃখা ভগিনীর মত জিজ্ঞাসা করিল মাত্র “কাঁদিতেছ কেন।”

আয়েষা আর আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না। দর দর ধারে তখন তাহার নয়নে অশ্রু-প্রবাহ বহিতে লাগিল। তিলমাত্র অপেক্ষা করা সঙ্গত নহে বুঝিয়া তখন আয়েষা কক্ষ ত্যাগ

করিয়া চলিয়া গেল। তিলোত্তমার মনে সে-সময়েও সংশয়ের কোনরূপ ছায়াপাত দেখা দিল না।

তিলোত্তমা যেন প্রকৃতির শিশু। এমন সরলা, এমন কোমলা, এমন স্নেহ-প্রেমময়ী নারী সংসারে দুর্লভ। খেলার পুতুলের মত তিলোত্তমাকে লইয়া প্রেমের খেলা চলে; ফুটন্ত কুসুমের মত আদর ও সোহাগের সাধ মেটে। তিলোত্তমা মিলনের বীণা। ইচ্ছামত কোমল স্বর বাজাও, শ্রবণ ভরিয়া যাইবে, হৃদয়ে একটি নূতন সুখাবেশ দেখা দিবে। মিলনের পর জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার দাম্পত্য জীবন কি ভাবে কাটিয়াছিল, তাহা অনুভবের বিষয়। তাই তাহা যবনিকার অন্তরালে রহিয়া গেল। কবির ভাষায় বলিতে পারি—"তুমুল ঝটিকাশেষে কুলে আগমনে"র মত ইহা বড় তৃপ্তিকর।

তিলোত্তমা সংযম ও সহিষ্ণুতার মূর্ত্তি নহে। সংযম বা সহিষ্ণুতার বলে আয়েষার মত সে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। জগৎসিংহকে পতিরূপে পাইয়া তিলোত্তমার নারীজীবন সার্থক হইল।

"প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা।"

আয়েষা।

আয়েষা কোমলা অথচ তেজস্বিনী। বালসূর্য্য-প্রভাসদৃশী হইয়াও কার্য্যক্ষেত্রে নৈদাঘ সূর্য্যরশ্মি। কারাগারে দ্বিধা সঙ্কোচ না করিয়া আয়েষা যখন স্নেহময়ী ভগিনীর মত মূর্চ্ছিতা তিলোত্তমাকে কোলে তুলিয়া লইল, প্রেমময়ী রমণীর মত কোমল করপল্লবে জগৎসিংহের করপল্লব গ্রহণ করিল, রাজপুত্রের ব্যথা-দর্শনে কাতরা

হইয়া দর দর ধারে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল—তখন কোমলা মূর্ত্তি।

করপল্লবে কবোষ্ণ বারিবিন্দুপাত অনুভব করিয়া জগৎসিংহ যখন সবিস্ময়ে আয়েষাকে কহে "তুমি কাঁদিতেছ আয়েষা?" আয়েষা সে কথার উত্তর দিবে কি? ধীরে ধীরে গোলাপ ফুলটী নিঃশেষে ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছিল মাত্র—এ প্রেমিকা মূর্ত্তি।

"আপনি" স্থলে সহসা "তুমি" সম্বোধনে আয়েষা বুঝিল, জগৎসিংহ তাহাকে আপন ভাবিয়া লইয়াছে। আয়েষা ইষ্টদেবতা ভবানীর মত জগৎসিংহকে মুক্তি দিবার প্রস্তাব করিল, কত অনুনয় বিনয় করিয়া কারাগার হইতে প্রস্থান করিতে বলিল। জগৎসিংহ তাহাকে বিপন্ন করিয়া মুক্তি চাহে না—দেখিয়া অভাগীর চক্ষুতে দর দর বারিধারা বহিল—এ করুণাময়ী দেবী মূর্ত্তি।

আয়েষা ওসমানকে স্নেহময়ী ভগিনীর মত স্নেহ করিয়া আসিয়াছে। তাহাকে বিবাহ করিবে, এ ইচ্ছা সে পোষণ করে নাই। তবে ওসমান্ যে প্রণয়িনী-জ্ঞানে তাহাকে ভালবাসিয়া আসিতেছে, তাহা অবশ্য আয়েষা জানিত। এজন্য একটি ব্যথাও যে তাহার মনে না জাগিত, তাহা নহে। প্রণয় ত আর ছেলে খেলা নহে, উহা ধরিয়া বাঁধিয়াও হয় না। তবে বালিকাবয়সে, যৌবনাবির্ভাবের পূর্ব্বে বিবাহ দিলে মন্ত্রের শক্তি, একত্রাবস্থিতি ও হৃদয়ভাব-বিনিময়ে ক্রমশঃ যাহা জন্মে—তাহার কথা স্বতন্ত্র। এস্থলে তাহা বিচার্য্য নহে।

আয়েষা সহানুভূতির আবেগে জগৎসিংহের কর দুটী যেরূপ

আকুল আগ্রহে ধরিয়াছিল, দর দর ধারে তাহার নেত্রে যে প্রকার অশ্রু বহিয়াছিল, তাহাতেই তাহার অন্তরে যে কি সুগভীর প্রেম ছিল, তাহা বুঝা যায়। তিলোত্তমাকে অগ্রে হৃদয়দান না করিলে আয়েষার ভালবাসায় জগৎসিংহ নিশ্চয়ই আকৃষ্ট হইত, তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। আর আয়েষা যদি জগৎসিংহের প্রণয় লাভ করিত, তাহাদের মিলনে ধর্ম্মসম্বন্ধে বিষম বাধা না থাকিত, তাহা হইলে আয়েষার প্রেমও এমন নিঃস্বার্থ হইতে পারিত না; বিধাতার চক্র সে অবস্থায় অন্যরূপ ঘুরিয়া যাইত। রাজপুতনার দুই একটি কন্যা যবনগৃহে বিবাহিতা হইয়াছিল বটে, কিন্তু পুরুষের যবনকন্যা-বিবাহ করিয়া হিন্দু থাকার দৃষ্টান্ত বড় পাওয়া যায় না।

জগৎসিংহ পলায়ন করিবে না। ভীরু কাপুরুষের মত পলায়ন করাকে লজ্জা বলিয়া মনে করিল। আয়েষা তখন কি করিল? চক্ষুর জলে বক্ষ ভাসাইয়া চিত্রার্পিত মূর্ত্তির মত শুধু দাঁড়াইয়া থাকিয়া জগৎসিংহের দুঃখ দেখা ব্যতীত সে আর করিতে পারে? এমন সময়ে কারাগারে ওস্‌মান আসিয়া ক্রোধ-কম্পিত স্বরে কহিল—"নবাবপুত্রি, এ উত্তম?"

এই "নবাবপুত্রী" বিশেষণটি এস্থলে বড়ই সার্থক। এইরূপ স্থলে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে ইহা "পরিকর" অলঙ্কার হয়। ব্যঙ্গে জ্বল জ্বল, ঈর্ষ্যায় থর থর, রাগে গর গর এই উক্তি শুনিয়া আয়েষার মুখ রক্তবর্ণ হইল। কোনমতে ধৈর্য্য ধরিয়া স্থিরস্বরে নবাবপুত্রী নবাবপুত্রীর মতই উত্তর দিল—"কি উত্তম ওসমান্"?

কথার উদ্দেশ্য বুঝিয়াও যেন আয়েষা বুঝে নাই। কারণ

এরূপ কথা বলার যখন ওসমানের অধিকারই নাই, তখন আয়েষা সেরূপ অর্থ বুঝিয়াও বুঝিবে কেন? সেই মত উত্তরই বা দিবে কেন?

"নিশীথে বন্দীসহবাস নবাবপুত্রীর পক্ষে উত্তম?" ওসমানের এই তীক্ষ্ণ কুৎসিত কথাটি আয়েষার কর্ণে যেন তপ্ত জলধারা বর্ষণ করিল। ওসমান্ জগৎসিংহের প্রতি আয়েষার আকর্ষণ সম্ভাবনা করিয়া তাহাকে তিরস্কার মাত্র করিবে, ইহাই আয়েষা আশা করিয়াছিল; কিন্তু "নিশীথে একাকিনী বন্দীসহবাস" এত বড় রূঢ় কথা ওসমান ব্যবহার করিবে, ইহা সে আদৌ প্রত্যাশা করে নাই। এই কুৎসিত তিরস্কার আয়েষার চিত্তে সহিবে কেন? এ হিংস্র বাণী শুনিয়া সে যে উত্তেজিতা হইবে, ইহাতে আশ্চার্য্য কি?

নবাবপুত্রীর যোগ্য আসনে বসাইয়া আয়েষা উত্তর দিল—"আমার কর্ম্ম উত্তম কি অধম, সে কথায় তোমার কোন প্রয়োজন নাই।" ওসমানের ক্রোধও দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। ব্যঙ্গের স্বরে উত্তর করিল—"আর আমিই যদি জিজ্ঞাসা করি?"

আয়েষার বিশাল লোচন বর্দ্ধিতায়তন হইল, মুখপদ্ম আরও প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। স্বর গর্ব্বিত ও গম্ভীর হইয়া আসিল,—তখন সে কি তেজস্বিনী মহীয়সী মূর্ত্তি! মস্তকের একদেশ হেলাইয়া তরঙ্গান্দোলিত শৈবালদলবৎ হৃদয় উৎকম্পিত করিয়া আয়েষা ওসমানকে কহিল—"এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।"

সেই মুহূর্ত্তে কক্ষে যেন বজ্রপতন হইল। আয়েষার নীরব রোদনের সুস্পষ্ট কারণ এইবার জগৎসিংহের চক্ষুতে প্রতিভাত

হইল। তিল তিল করিয়া আয়েষার অনেক দিন অনেক ব্যবহারের অর্থ, অনেক কথাই তখন তাহার স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠিল। ওসমান্ অবিশ্বাসিনী বলিয়া ভিতরকার সুপ্ততেজ জাগাইয়া না দিলে আয়েষা কখনই মনের কপাট খুলিত না। সতীত্বের উপর আঘাতের মত নারী-সম্মানের অবমাননাকর আঘাত আর নাই। সে আঘাতে যে নারীর হৃদয় মাথা খাড়া করে না—সে নারী-নামের অযোগ্য। উত্তেজনার মুখে মানুষের চিরগুপ্ত অনেক কথাই ব্যক্ত হয়; যত্ন-রুদ্ধ ভালবাসার আবরণটি পর্য্যন্ত ছিন্ন হইয়া পড়ে; ভাব ভাষায় ফুটিয়া উঠে। আয়েষার তাহাই হইল।

আয়েষার চক্ষু ফাটিয়া তপ্ত অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল। সেই জ্বালাময়ী রুক্ষ মূর্ত্তি ক্রমশঃ কোমল হইয়া আসিল। আয়েষা তখন চক্ষু মুছিল। যে আয়েষা, সেই আয়েষা হইল। কেবল একটি জলোচ্ছ্বাস নদীর উপর দিয়া বহিয়া গেল। ভূমিকম্প ধরার আপাদ-মস্তক একবার মাত্র টলাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। প্রবল ঝটিকার পর প্রকৃতির অবস্থার মত তখন কক্ষটি আবার নিথর ভাব ধারণ করিল।

ওসমান স্থির, মৌন। তাহার এই সম্ভাবনা যে আজ সত্য হইয়া উঠিবে—এ যে স্বপ্নের অগোচর! বৃশ্চিক মনে করিয়া অগ্রসর হইয়া দেখিল, এ যে সম্মুখে দংশনোদ্যত ভীষণ সর্প! ওসমান্ এতদিন ধরিয়া যে আশালতাটীর মূলে জলসেক করিয়া আসিয়াছে, আজ তাহা যে, এইরূপে উন্মুলিতা হইয়া যাইবে, তাহা ভাবনার অতীত।

আয়েষা ইহা বুঝিল। আয়েষা ওসমানের অবস্থা বুঝিয়া স্নেহময়ী ভগিনীর মত কত স্নেহের সান্ত্বনা-বাণী বলিল। ওসমানের হৃদয়ের লেলিহান অগ্নি সপ্তসমুদ্রের বারিসেকে তখন নিভিবে না। আয়েষার অনুরোধবাণী বৃথা হইল। আয়েষা তখন দাসীর আগমন অপেক্ষা না করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। ওসমানও কিয়ৎক্ষণ বিহ্বলের মত অপেক্ষা করিয়া নিজ মন্দিরে প্রস্থান করিল।

সেই রাত্রেই—জন্মদিনের সেই উৎসবরাত্রেই নবাব কতলু-খাঁর বক্ষে বিমলার আমূল ছুরিকা প্রোথিত হইল। আহত নবাব মৃত্যুশয্যায় ঢলিয়া পড়িল।

মুমূর্ষু পিতার মস্তক ক্রোড়ে করিয়া তখন ভূমিতলে লুণ্ঠিতা আয়েষা নিঃশব্দে উপবিষ্টা। নয়নাশ্রু-ধারায় মুখখানি তাহার পরিপ্লাবিত। মূর্ত্তি স্থির, গম্ভীর ও নিষ্পন্দ। সহিষ্ণুতার প্রতিমা আয়েষার চক্ষুতে পলক নাই, দৃষ্টি যেন কোথায় নিবদ্ধ। এমন সময় আহূত হইয়া জগৎসিংহ কতলুখাঁর পার্শ্বে আসিয়া বসিল। সন্ধি-প্রার্থনায় জগৎসিংহকে একপ্রকার সম্মত করাইয়া নবাবের মৃত্যুপীড়িত মুখ প্রদীপ্ত হইল। সেই সাংঘাতিক মুহূর্ত্তেও আয়েষার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অতুলনীয়। পিতার কর্ণে আয়েষা সে সময়ে কি কথা বলিল, নবাব মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্যেই বলিয়া গেল "বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা সাধ্বী, তুমি দেখিও।"

আয়েষা মৃত্যুকালে ঐ কথাটি বলাইয়া পিতাকে দিয়া একটি বড় রকমের পুণ্যকার্য্য করাইল। আয়েষার নাম মুখে করিয়াই নবাবের নির্জ্জীব মস্তক ভূমির উপর লুটাইয়া পড়িল। আয়েষা

কাঁদিল না, মূর্চ্ছিতা হইল না; শোকভারস্তম্ভিতা হইয়া কেবল বসিয়া রহিল। এ এক সংযত শোকমূর্ত্তি।

এবার জগৎসিংহের শিবির-ভঙ্গের প্রয়োজন। প্রস্থান সময়ে জগৎসিংহ আয়েষার সাক্ষাতের প্রার্থী হইলেও আয়েষা সাক্ষাৎ করিল না। ওসমানের হৃদয়ে প্রেমাগ্নি দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিবে, এবং সে নিদারুণ ব্যথা পাইবে—সেইজন্যই আয়েষা পাষাণীর মত সাক্ষাৎ না করার যে কষ্ট, তাহা সহ্য করিয়াছিল। আত্মধৈর্য্যের প্রতি অবিশ্বাসিনী বলিয়াই সে যে সাক্ষাৎ করিল না, তাহা নহে। আর বারান্তরে সাক্ষাতেরও সে বড় প্রত্যাশা রাখে না। নারীহৃদয় দুর্দ্দমনীয়, অধিক সাহস অনুচিত—এ আশঙ্কাও তাহার ছিল। তবে এই প্রদেশে যদি জগৎসিংহ বিবাহ করেন, তবে যেন তাহাকে সংবাদ দেওয়া হয়,—জগৎসিংহের নিকট আয়েষা এই অনুরোধ মাত্র করিয়াছিল। আয়েষা জগৎসিংহকে যে পত্রখানি লিখিয়া সাক্ষাৎ না করার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে—তাহা বড়ই করুণ, বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। এই পত্রখানির ভিতর দিয়া তাহার পবিত্র স্বচ্ছ হৃদয়টি বড়ই সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার বিবাহোৎসবে আয়েষা নিমন্ত্রিতা হইয়া গিয়াছে। মহামূল্য রত্নালঙ্কার প্রস্তুত করাইয়া তিলোত্তমাকে মনের মত সাজাইবে—ইহাই তাহার সাধ। নিজহস্তে অলঙ্কার পরাইয়া আয়েষা তিলোত্তমার সরল প্রেমপ্রতিম মুখখানি তুলিয়া ধরিল; "এ মুখখানি দেখিয়া প্রাণেশ্বর মনঃপীড়া পাইবেন না—" ভাবিয়া আশ্বস্তাও হইল।

"যখন বিধাতা অন্যরূপ ঘটাইলেন না, তখন ইহার দ্বারা তিনি

সুখী হউন”—কায়মনোবাক্যে আয়েষা এই প্রার্থনাই করিল। “অন্যরূপ—” এস্থলে আয়েষার সহিত জগৎসিংহের মিলন। এ মিলন যে আয়েষার আন্তরিক অভিপ্রেত ছিল, তাহা বুঝা যায়। জগৎসিংহ যে তিলোত্তমাগত-প্রাণ, ইহা সে অগ্রেই জানিয়া ছিল। জগৎসিংহ আয়েষার নহে, তিলোত্তমার, ইহা সে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছিল। কাজেই বুদ্ধিমতী আয়েষা প্রবৃত্তি দমন করিবে না, ত কি করিবে? এই প্রধান বাধা (তিলোত্তমানুরাগ) না থাকিলে কি হইত বা মাত্র ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বাধা বা ওসমানের মর্ম্মান্তিক ব্যথার জন্য আয়েষা কি করিত, না করিত, তাহার বিচার নিষ্প্রয়োজন।

পূর্ব্বে আয়েষা নবাবপুত্রী বলিয়াই বন্দী রাজপুত্রকে “তুমি” সম্বোধন করিত; আর আজ জগৎসিংহের অনুরাগিনী হইয়া কেমন করিয়া “তুমি” সম্বোধন করিবে? “এ সকল তাঁর চরণরেণুর তুল্য নহে” বলিয়া নিজেকে যে দাসীর আসনে বসাইয়া রাখিয়াছে, সে আর “আপনি” সম্বোধন না করিয়া পারে না। জগৎসিংহ কারাগারে প্রথমে আয়েষাকে “আপনি” বলিত। “তুমি কাঁদিতেছ আয়েষা” বলিয়া “তুমি” ধরিল। আয়েষার “তুমি” “আপনি” হইল। জগৎসিংহের “আপনি” “তুমি” হইয়া গেল।

আয়েষা সংযমে, সহিষ্ণুতায় এবং স্বার্থত্যাগে আদর্শ। তথাপি সে হৃদয়ে রমণী, রক্তমাংসে গড়া মানবী। “আমার—তোমার সাররত্ন” বলিতে যাইয়া তাহার কণ্ঠরোধ হওয়াই স্বাভাবিক। প্রেমিকা যুবতী ব্যর্থ জীবনভারে ব্যথাপ্রাপ্তা হইয়া যদি কাঁদিয়াই থাকে—তাহাতে তাহার নারীত্বই পরিস্ফুট, হৃদয়বত্তাই প্রকাশিত

হইয়াছে। সে ত আর পাষাণ-নির্ম্মিতা নহে যে, তাহার সান্ধ্য সমীরণ-কম্পিত নীলোৎপলবৎ চক্ষু অশ্রুভরে টলমল করিবে না? তৃষাতুর বিশুষ্ক অধর প্রণয়-বারি-পানাশায় ক্ষণকালের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে না?

নিরাশ প্রেমিকা বলিয়াই সে সর্ব্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী। তিলোত্তমাকে বঞ্চিত করিয়া, প্রাণেশ্বরের ধর্ম্ম লোপ করিয়া সুখ-ভোগ বা স্বার্থসিদ্ধি হইবে—এ আশা সে রাখে না। ওসমানের হৃদয়ে ব্যথা দিয়া সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিতেই সে সম্মতা হয় নাই; প্রলোভনের বস্তু বলিয়া গরলাধার অঙ্গুরীয়টি পর্য্যন্ত জলে নিক্ষেপ করিয়া ফেলিল।

প্রলোভন-জয়ই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। সংযম, সহিষ্ণুতা ও ত্যাগই মানুষের বরণীয়। প্রলোভনজয়ে প্রতাপ এক দিকের আদর্শ। আয়েষা অন্য দিকের আদর্শ। প্রতাপ, শৈবলিনীর প্রণয়-প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহারই মঙ্গলের জন্য তাহার কথায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল বলিয়া দেবতা, আর আয়েষা দুর্ব্বলহৃদয়া নারী—স্মৃতিমাত্র সম্বল করিয়া সারাজীবন সন্ন্যাসিনীভাবে কাটাইয়া দিল বলিয়া দেবী। প্রতাপ কঠিনচেতা বীর হইয়া রূপসীকে বিবাহ করিয়াছিল। আয়েষা কোনসময়ই বিবাহের কল্পনা পর্য্যন্ত করে নাই। তবে জগৎসিংহের স্মৃতি আয়েষার জীবনের বন্ধনী, উহাই তাহার জীবন বাঁচাইয়া রাখে। শৈবলিনীর স্মৃতি প্রতাপের নিকট বৃশ্চিকদংশনবৎ মর্ম্মান্তিক, মহাপাতকবৎ হেয়—তাই প্রতাপ বাঁচিয়া থাকিতে পারে নাই।

"চিত্তজয়ে এবং প্রলোভনজয়ে" যদি পুণ্য থাকে, তবে আমরাও

বলি "সে স্বর্গ তোমার আয়েষা"। পরলোকে সুখময় স্বর্গই তোমার প্রণয়ের পুরস্কার। ইহলোকে যতদিন বঙ্গসাহিত্যের জীবন, ততদিন তোমার নাম জনে জনে কীর্ত্তন করিবে। পাশ্চাত্য রমণী রেবেকার অপেক্ষা তোমার স্থান উচ্চে। আয়েষা, প্রার্থনা করি, পরলোকে জন্মান্তরে তুমি সুখিনী হইও। তোমার আত্ম-ত্যাগপূত জীবনচরিত্রের মাহাত্ম্যগুণে ভারতের নরনারী যেন তোমার মত স্বার্থত্যাগ শিক্ষা করিয়া ধন্য হইতে পারে।

কুন্দনন্দিনী।

কুন্দ ছোট ফুল। তাহার শুভ্র সরল মুখখানি দেখিতে যত সুন্দর, গন্ধ কিন্তু তত মধুর নহে। হৃদয়দেশে গুপ্ত, অতি মৃদু তাহার গন্ধ—তাই কুন্দফুল যুথিকা, জাতি, বেলা মল্লিকা, গোলাপ বা চামেলীর মত তত কার্য্যে আইসে না। বিলাসীর প্রমোদ-উদ্যানে ফুটিলেও স্বভাবের আরণ্যভাব তথাপি যেন তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিস্ফুট।

কুন্দনন্দিনীও ঠিক কুন্দফুলেরই মত। তাহার সরল শুভ্র মুখখানি দেখিলে কুন্দফুলের স্মৃতিই হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। গন্ধ গুণপদার্থ। কুন্দের গুণও সংসারে বড় উপকারে আসিল না। কুন্দফুলের মধুর মত কুন্দের প্রেম অতি অল্পই পাওয়া যাইত। তার প্রেম ঐ মধুর মতই হৃদয়ের অতল দেশে লুক্কায়িত থাকিত। কুন্দের প্রেম অস্ফুট-কলস্বনে হৃদয়বালুকার মধ্য দিয়া নীরবে বহিত, কেহ জানিতে পারিত না, আপনিও বড় তাহা বুঝিতে পারিত না। তার প্রেম গভীর; উপরে বহির্বিকাশ বড় দেখা যাইত না। ক্ষুদ্র পল্লীর ঘনান্ধকার ছায়ার তলে সে ফুটিয়াছিল। তারপর অদৃষ্টের বলে ধনীর প্রমোদভবনে সে আশ্রয় পায়। অতি শৈশবেই তাহার জননী তাহাকে ফেলিয়া স্বর্গে চলিয়া যান; তারপর দরিদ্র প্রৌঢ় পিতার কোলেই সে বাড়িয়া উঠে। কুন্দ যে পিতার অধিক বয়সের সন্তান, তাহা

তাহার দেহে, প্রকৃতিতে সুপরিস্ফুট। দরিদ্র মাতৃহারা কুন্দ শৈশবে আত্মীয়স্বজনের কোনরূপ আদর পায় নাই, প্রতিবেশীর সহানুভূতিও বড় বেশী লাভ করে নাই; কাজেই স্বভাবের সরল অকৃত্রিম আরণ্যভাব সে যথেষ্টপরিমাণেই পাইয়াছিল।

কুন্দকে আমরা প্রথম মুমূর্ষু পিতার পদতলে "তুষারপরীত-মুখ" কুন্দফুলটীর মতন দেখিতে পাই। কুন্দ তখন ভগ্নস্বরে অন্ধকার কক্ষে—'বাবা বাবা' করিয়া ডাকিতেছিল। কুন্দ তখন কিশোরী—"অনিন্দিতগৌর-কান্তি," ও স্নিগ্ধ-জ্যোতিরূপা! মাতৃহারা অভাগী একমাত্র অবলম্বন পিতাকে হারাইল। প্রতিবেশীরাও কেহ অসহায়া দরিদ্রকন্যার ভার লইতে চাহিল না। তখনই এক দেবসদৃশ পুরুষ আসিয়া বালিকাকে কুড়াইয়া লইল। সে-পুরুষ "বিষবৃক্ষ"-গ্রন্থের নায়ক, সূর্য্যমুখীর সাতরাজার মাণিক, জমিদার নগেন্দ্রনাথ দত্ত। কে জানিত, মাধবীলতা আজ যাহাকে সহকার বলিয়া আলিঙ্গন করিল, সে অগ্নিগর্ভ শমী। কলিকাতায় কুন্দের আত্মীয়ের সন্ধান মিলিল না, কাজেই কিছুদিন তাহাকে কলিকাতায় কমলমণির আশ্রয়ে থাকিয়া শেষে দত্তগৃহের প্রকাণ্ড অট্টালিকায় চিরস্থায়ী স্থান লাভ করিতে হইল।

অনাথাকে যে পথ হইতে কুড়াইয়া লয়, সে দেবতা। কুন্দও দেবকান্তি নগেন্দ্রনাথকে দেবতারূপেই দেখিল, নগেন্দ্রের দয়ার্দ্র ও স্নেহভরা প্রাণের পরিচয় পাইয়া বালিকার অন্তঃকরণ গভীর কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হইল, অহেতুক স্নেহ বালিকার সুকোমল হৃদয়ে দৃঢ় রেখা অঙ্কিত করিল। কুন্দ বাঙ্গালী মেয়েদের বিবাহের সাধারণ বয়স অতিক্রম করিয়াছিল, কাজেই সেই-বয়সে নগেন্দ্রের

দেবকান্তি দেখিয়া, অগাধ স্নেহ পাইয়া সে তৎপ্রতি আকৃষ্টা হইল। হৃদয়-পীঠে দেবতার মত বসাইয়া, শ্রদ্ধাচন্দন-চর্চ্চিত ভালবাসার কুসুমে গোপনে প্রাণ ভরিয়া পূজা করিতে লাগিল।

ভালবাসা অনেক কারণে জন্মে। তন্মধ্যে চারিটি কারণ প্রধান, চারিটির মধ্যে প্রথম তিনটি কারণই কুন্দের ভালবাসায় দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) কাহাকে দেখিবামাত্রই কাহারও প্রাণে যে অনুরাগ জন্মে, তাঁহাই চক্ষুরাগ, অহেতুকী প্রীতি অথবা তারামৈত্রক নামে অভিহিত হয়।

(২) আর গুণের পরিচয় পাইয়া ক্রমশঃ হৃদয়ে যে গুণবানের প্রতি আকর্ষণ জন্মিয়া থাকে, ভাবনাদ্বারা সংসর্গফলে সেই আকর্ষণ বহুদিনের "নিবিড়বন্ধ" গাঢ় প্রেমে পরিণত হয়। ইহাই গুণজ প্রেম।

(৩) আর কৃতজ্ঞতা হইতে উপকারীর প্রতি যে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও অসীম নির্ভরতার ভাব আইসে, ক্রমে ক্রমে যে একটি স্নিগ্ধকোমল আকর্ষণ কৃতজ্ঞের অন্তঃকরণে জাগিয়া উঠে, ইহাও এক জাতীয় ভালবাসা।

(৪) আর এক ভালবাসা—যাহা আমাদের দাম্পত্য-জীবনের মূল, সমাজের, দেশের ও জাতির আদর্শ,—যাহাতে সংসারে, পরিবারে ও জীবনে, সুখ শান্তি, ও গৌরব—ইহাই আমাদের দাম্পত্য প্রণয়। বিবাহের মন্ত্রেই ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

নগেন্দ্রনাথের রূপ গুণে দয়া মায়ায় কুন্দের সরল কিশোর প্রাণ দ্রবীভূত হইল। ক্রমশঃ সে এত তদ্ভাববিভোরা হইয়া উঠিল

যে, মাতার স্বপ্নের কথা তার আর অধিকদিন মনে রহিল না। স্বপ্ন স্বপ্নবৎ হইয়া গেল। এত সুন্দর, এত মধুর, এত উদার, দেবোপম নগেন্দ্রনাথকে ভয় করিবে কি, কুন্দ মনে মনে ভালবাসিয়াই ফেলিল।

কাহাকে জানিতে না দিয়া, কোনরূপ আশা আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া কুন্দ নগেন্দ্রের অনুরাগিনী হইল। প্রতিদান সে চাহে নাই ; চাহিবার মত অবস্থাও তাহার গড়িয়া উঠে নাই। লজ্জাশীলা নববধূর মত কুন্দ নগেন্দ্রনাথকে পতির ভাবেই দেখিল। তবে সূর্য্যমুখীর স্বামী বলিয়া তাহাকে পতিরূপে লাভ করিবে, এ প্রত্যাশা অবশ্য সে করে নাই। কুন্দের এ ভালবাসা বড় মধুর, বড় গভীর আর বড় সুন্দর।

আশ্চর্য্য এই যে—কুন্দের এই ভালবাসার বননদীটিই একদিন গিরিতটিনীর আকারে পার্ব্বত্যপথে ছুটিয়া চলিবে ; স্থির অচঞ্চল উর্ম্মিমালার উপর কামমোহের প্রবল তুফান দেখা যাইবে ; নগেন্দ্রের ভালবাসার পরিচয় পাইবামাত্র এই আশাআকাঙ্ক্ষাশূন্য হৃদয়ই একদিন তাহাকে পাইবার জন্য ভিতরে ভিতরে উন্মত্ত ও মাতোয়ারা হইয়া উঠিবে।

কুন্দ সহিষ্ণুতার প্রতিমা। ভিতরে তুষাগ্নি ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে, উপরে তার কি সুশীতল স্পর্শ! ভিতরে প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে, আর মুখে কি মৃদু মধুর হাসি। উচ্চ আশা আকাঙ্ক্ষা তাহার নাই, এরূপ সরল বন্যমৃগী-জাতীয়া অবলাদের থাকেও না। বনের তৃণ, নদীর জল, শয়ন করিবার আর দৌড়াইবার স্থান পাইলেই তাহারা সন্তুষ্ট। তারাচরণের সহিত বিবাহ স্থির ; বিবাহ যে কি

আর বিবাহে তাহার ব্যথাই বা কি, সে সকল ভাবিবার তার শক্তিও নাই। এ বিবাহে সে কোন কথাই বলে নাই ; এ সম্বন্ধে বড় অধিক চিন্তাও সে করে নাই। কুন্দের হৃদয়ের প্রতি ভালরূপ লক্ষ্য করিলে বোধ হইত যে—সে প্রাণহীনা পাষাণপ্রতিমা। বাস্তবিক সে কি তাই ? যে ভালবাসিতে জানে, সে কি প্রাণহীনা পাষাণী ?

কুন্দ নগেন্দ্রনাথকে আদর্শ বলিয়া ভাবিত, আকাশের চাঁদের মত দেখিত। আকাশের চাঁদ পাইবার নহে, ধরায় আসিয়া সে চাঁদ ধরা দিবে না। আর এ উচ্চ আশা সে করেওনা। এত সরলা এমত শিশুসুলভ-স্বভাব-বিশিষ্টা সে, নিজের হৃদয়েই সঞ্জাত প্রেম-বীজের সন্ধানই পায় নাই। হৃদয় কি চাহে, কি পাইলে, কি ভাবে পাইলে সাধ মিটে, তাহা সে আদৌ বুঝে নাই। যে ভালবাসায় আশা বা অহঙ্কার থাকে না, সে ভালবাসা মানুষকে অধৈর্য্য করে না, মর্ম্মে পীড়া দেয় না। বাস্তবিক নিজের হৃদয়ের ভালবাসাই যে বোঝে না, সে নগেন্দ্রের প্রতি আপনার মনোভাব কিরূপ, তাহা বুঝিবেই বা কিরূপে ? অবশ্য নগেন্দ্রকে পতিরূপে পাইলে কুন্দের বড় আনন্দ হইত সত্য, কিন্তু না পাওয়ার জন্য কোন দুঃখ হইয়াছিল—তাহাও আমরা ধরিতে পারি নাই। কুন্দের বয়সে সাধারণ মেয়েদের যে অনুভূতি থাকে, স্বভাব-সরলা কুন্দনন্দিনীতে সে অনুভূতিই জন্মে নাই। বয়সোচিত জ্ঞান, ধর্ম্ম, ভাব বা প্রবৃত্তি তাহাতে সম্যক্ স্ফূর্ত্তিলাভ করে নাই।

কুন্দ তারাচরণের সহিত পতিপত্নী-ভাবে দুইটি বৎসর বাস করিল। তারাচরণকে পতিরূপে পাইয়া সে যে শান্তি পায়

নাই, যৌবনের উন্মাদক ভাব-প্রবাহের সে যে সন্ধান পায় নাই, ভুলিয়াও একদিন দেহেন্দ্রিয়ে বা মনে প্রাণে সে যে আবেশের সুখস্পর্শ অনুভব করে নাই—তাহা নিশ্চয়। কুন্দ যে তারাচরণকে পতিভাবে ঠিক আদর করে নাই বা পতির যোগ্য পূজা দিতে পারে নাই, তাহাও যথার্থ।

কুন্দ বাহিরেই তারাচরণের স্ত্রী ছিল মাত্র। দেহ তাহার দাসত্ব করিতে পারে, যৌবন পাত্র ভরিয়া উন্মাদক সুরা মুখে তুলিয়া ধরিতে পারে,—তথাপি তাহার মন ও প্রাণ যে তারাচরণের দাসত্ব করে নাই—তাহাতে সন্দেহ নাই। ভোগের মধ্যে আসিলেই ভোগস্পৃহা জাগিয়া উঠে। তারাচরণের সংস্পর্শে কুন্দনন্দিনীর ভোগস্পৃহা ক্রমে জাগিতে লাগিল, অথচ সে স্পৃহা তারাচরণকে দিয়া আদৌ মিটিল না। তারাচরণ ভাল-বাসার ভাণ করিত, কুন্দের রূপ-যৌবনের লোভে চাটুকারিতাও যে কোন দিন না করিত, তাহাও নহে। কাজেই কুন্দ ধীরে ধীরে, ভালবাসা কি, সোহাগ আদর কি, সমস্ত বুঝিল। আর, বয়সের সঙ্গে অপরিতৃপ্তির মধ্যে থাকিয়া কুন্দ তাহার অভাব মর্ম্মে মর্ম্মেই অনুভব করিল। বহুকাল-নিদ্রিতা রাজকন্যার মত সে একদিনেই নিজের যৌবনাবির্ভাব অনুভব করে নাই, অথবা শকুন্তলা বা দময়ন্তীর মত চক্ষুর দেখা পাইয়াই, কি রূপগুণের কথা শুনিয়াই অমনই মুগ্ধও হইয়া পড়ে নাই। তিলে তিলে অনুরাগের সঞ্চার, আর তিলে তিলেই তাহার অনুভূতি। যে মদিরায় কুন্দ উন্মত্ত, তাহা বাহ্য উপাদানে প্রস্তুত নহে। যে অমৃতধারায় সে আত্মহারা, তাহা স্বর্গেরও সামগ্রী নহে।

কুন্দ আর এখন সে কুন্দ নহে। নগেন্দ্রের স্থান এখন কোথায়, তাহা সে বুঝিয়াছে। নগেন্দ্রকে সে, কি ভাবে চাহে, কি ভাবে পাইলে তাহার আকাঙ্ক্ষা মিটে, তাহা সে বুঝিয়াছে। অমর কবি বলিয়া না দিলেও আমরা ধরিয়া লইতে পারি, অন্যাসক্তা হইয়াও কুন্দ শান্ত-শিষ্টভাবেই সংসার করিয়াছিল।

তারপর তিনদিনের জ্বরবিকারে তারাচরণের মৃত্যু। কুন্দেরও বিধবার সাজে দত্তগৃহে চিরস্থায়ী স্থানলাভ। বিবাহেও তাহার সুখ দুঃখ কেহ দেখে নাই, বিধবা অবস্থাতেও কেহ দেখিল না। কুমারী, বিবাহিতা বা বিধবা কুন্দের মধ্যে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন কাহারও দৃষ্টিতে পড়ে নাই। সে পাষাণপ্রতিমা বলিয়াই সকলের নিকট প্রতীত ছিল।

কুন্দের এখন ভরা যৌবন। অতৃপ্ত লালসার স্রোত, পরিপূর্ণ দেহের দুইকূল ছাপাইয়া বহিয়া যাইতেছে। শীতল মৃদু শোণিত আজ উষ্ণ হইয়া খরবেগে ধমনীর ভিতর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। সে স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি আর নাই; কুন্দ এখন তীব্র জ্বালাময়ী বহ্নিশিখা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অভাগী এখন সকল বিষয়ই বুঝিয়াছে; সূর্য্যমুখীর প্রতি ভিতরে ভিতরে একটি সূক্ষ্ম ঈর্ষ্যার ভাব তাহার জাগিয়াছে। কেমন একটি অব্যক্ত বিতৃষ্ণা আসিয়া তাহার মর্ম্মের মাঝে অলক্ষ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রের স্নেহ পূর্ব্ব হইতেই ছিল। কুন্দের বৈধব্য বেশ দেখিয়া সেই স্নেহ উথলিয়া উঠিল। যে স্নেহ কোমল আকর্ষণরূপে হৃদয়ে লুকান ছিল, তাহাই এক্ষণে কুন্দের সংস্পর্শে আসিয়া ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া তীব্র ভাব ধারণ করিল। কুন্দের রূপ-

যৌবনের উষ্ণতাপে সে স্নেহ গলিয়া গিয়া নূতন ছাঁচে পড়িয়া প্রেমরূপে পরিণত হইল। কুন্দ যে, এতদিন প্রাণ ভরিয়া গোপনে গোপনে নগেন্দ্রকে ভালবাসিয়া আসিয়াছিল, তাহারই প্রতিক্রিয়া এখন আরম্ভ হইল। কুন্দের ভালবাসাই নগেন্দ্রকে স্বর্য্যমুখী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আপনার দিকে আকর্ষণ করিল।

কুন্দের অঙ্গসঞ্চালনে, কণ্ঠস্বরে, প্রতিপদক্ষেপে গভীর প্রেম ফুটিতে থাকিল। হাসির আভায়, লাবণ্যের প্রভায়, কটাক্ষের বিদ্যুচ্ছটায় উন্মাদক মোহ জাগিয়া উঠিল। হাব ভাব বিলাস বিভ্রমে ভোগস্পৃহা আপনিই উদ্রিক্ত হইয়া পড়িল। কুন্দ এখন অগ্নিগর্ভ শমী, জ্বালাময়ী বিদ্যুৎশিখা।

নগেন্দ্র সমস্তই দেখে। দেখিয়া পতনোন্মুখ অশ্রু কোন-মতে চাপিয়া রাখে। ক্রমশঃ কুন্দের প্রেম এমনভাবে তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া রহিল যে, তাহা হইতে আপনাকে বিমুক্ত করিতে নগেন্দ্র কোনমতে পারিল না। আপনার মনটিকে কোনরূপে দমন করিতে না পারিয়া শেষে সুরাপায়ী, অসহিষ্ণু ও ক্রোধী হইয়া উঠিল। স্বর্য্যমুখী বুঝিল, নগেন্দ্র এখন কুন্দের প্রতি অনুরক্ত। কাম এবং মোহ ধীর ব্যক্তিকে অধীর, শীতল জনকে উত্তপ্ত ও দুর্ব্বল লোককে শয্যাশায়ী করে।

নগেন্দ্র যে তাহাকে ভালবাসিয়াছে, ইহা কুন্দ নিজে ভালরূপ বুঝে নাই; কমলমণির কথায় তবে বুঝিল। কুন্দের মত্ত মন বাধা মানিবে কেন? প্রণয় তখন শতবাহু বিস্তার করিয়া তাহার কোমল অঙ্গ জড়াইয়া ধরিয়াছে। মদনদেবতাও অবসর বুঝিয়া কোমল হৃদয়ে শরক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

অতৃপ্ত লালসারাক্ষসী তখন লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া নগেন্দ্রের অস্থিমাংস চর্ব্বন করিতে বসিয়াছে।

কুন্দ দেখিতে পায়, নগেন্দ্র তাহাকেই খোঁজে, তাহারই কণ্ঠস্বর শুনিবার আশায় নগেন্দ্র উৎকর্ণ হইয়া থাকে। বিভোরা বালা এইবার মরিল। যে নিস্তরঙ্গা স্থির নদী ছিল, সে আজ খরতরঙ্গা, কুলঙ্কষা হইয়া উঠিয়াছে। মোহের বাণ ডাকিয়াছে, কামের গৈরিক স্রোত আসিয়া মিলিয়াছে, সংযমের বাঁধও একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে; তটভূমির উপর জলস্রোত সবেগে প্রহত হইয়া বিচূর্ণিত হইয়া যাইতেছে। কুন্দের অবস্থা এইরূপ সঙ্গীন।

কুন্দ বুভুক্ষু হৃদয়, পিপাসু অধর, তৃষ্ণাতরল চক্ষু আর পরিপূর্ণ যৌবনভার লইয়া নগেন্দ্রের চারিপার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; সূর্য্যমুখীর "সাতরাজার মাণিক" অপহরণ করিয়া নিজের হৃদয়-কৌটায় আবদ্ধ করিবার উপক্রম করিতেছে। সংবাদ পাইয়াই কমলমণি আসিয়া উপস্থিত। সূর্য্যমুখীর ভাঙ্গা কপাল জোড়া দিবে—ইহাই তাহার একান্ত আকাঙ্ক্ষা।

কমলমণি সমস্ত বুঝাইয়া কুন্দকে আপনার সঙ্গে কলিকাতায় লইয়া যাইতে চাহিল। পরের মঙ্গলমন্দিরে আত্মবলি দিতে কুন্দ স্বীকৃতাও হইল। নগেন্দ্রকে বিস্মৃত হওয়া, সে যে অসম্ভব; নগেন্দ্রকে দেখিতে না পাওয়া, সে যে মৃত্যুদণ্ড; তথাপি কুন্দ কমলমণির সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত।

রাত্রে শয়ন করিয়া কুন্দ অনেক কাঁদিল। শেষে, না—; কলিকাতায় যাইয়া সে থাকিতে পারিবে না। "তার জন্য

অনেকে মরে, সংসার যে ছারেখারে যায়—”এ অবস্থায় কুন্দের দত্তগৃহে থাকাও ত আর চলে না। আত্মহত্যা ব্যতীত অন্য উপায়ই বা কি? কুন্দ কাহাকেও না বলিয়া রাত্রে পুষ্করিণীতে ডুবিয়া মরিতে গেল। কুন্দের এ আত্মহত্যার ইচ্ছাও পরের মঙ্গলমন্দিরে আত্মবলি। “দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে মরার চেয়ে একেবারে জন্মের মতই মরা ভাল” বুঝিয়া রোহিণী জলে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল, রোহিণীর সে আত্মহত্যা। আর কুন্দের এ আত্মবলি।

কুন্দ সরোবরের সোপানতলে তখন দাঁড়াইয়া—“নগেন্দ্র নগেন্দ্র আমার নগেন্দ্র” করিতেছে, “আম'লো আমার কেন সূর্য্যমুখীর”—এইরূপ প্রকৃতিসিদ্ধ ঈর্ষ্যার স্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়া দিতেছে। “আচ্ছা সূর্য্যমুখীর সহিত বিয়ে না হ'য়ে যদি আমার সঙ্গে” —কুন্দ আর ভাবিতে না পারিয়া মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে বসিল।

এমন সময়ে কুন্দের পৃষ্ঠে কাহার হস্ত পড়িল। তড়িৎ-স্পর্শবৎ সে স্পর্শে তাহার দেহ চমকিত হইয়া উঠিল। কুসুমগন্ধবৎ সে স্পর্শে আত্মহারা তাহার তখন “ন যযৌ ন তস্থৌ” অবস্থা। “স্ফুটকোরক” কদম্বযষ্টির মত তাহার দেহযষ্টি তখন রোমাঞ্চ-কণ্টকিতা।

নগেন্দ্রনাথ তখন “বিধবাবিবাহ চলিত হইতেছে,—আমি তোমাকে বিবাহ করিব”, বলিয়া লোভ দেখাইতেছিল; অপরিমিত প্রেম উচ্ছ্বসিত ভাষায় ব্যক্ত করিয়া প্রেমমুগ্ধাকে আরও মুগ্ধা করিয়া তুলিতেছিল। সেই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে সরলা মুগ্ধা তরুণী তথাপি আপনাকে সংযত করিয়া রাখিয়াছে। পরের মঙ্গল-

মন্দিরে আত্মবিসর্জ্জন করিবার জন্যই যে মরিতে আসিয়াছে—ভোগের পঙ্কে মগ্ন হইবার আহ্বান সে প্রত্যাখ্যান না করিয়া পারে না।

আশা ও আকাঙ্ক্ষা যখন মিটিবার সম্ভাবনা থাকে না, তখনই লোকে ভালবাসা চাপিয়া রাখে। ইন্ধন-অভাবে অগ্নি-শিখার মত সে ভালবাসা ক্রমশঃ নির্ব্বাপিতই হইয়া আইসে। কুন্দ যখন জানিল, নগেন্দ্র তাহাকে ভালবাসে, তখন তাহার আশা ও আকাঙ্ক্ষা হৃদয়মন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। হৃদয়-পুট-নিরুদ্ধ ভালবাসা তখন উৎসাকারে ফুটিয়া উঠিয়া অমৃতরসধারায় তাহাকে অভিষিক্ত করিয়া দিল। কুন্দের শুষ্ক কণ্ঠ তখন চাতকের মত নবমেঘোদকের আশায় ব্যাকুল, আর নগেন্দ্রনাথ তখন সেই শুষ্ক কণ্ঠের উপর বৃষ্টির ধারা-বর্ষণে প্রবৃত্ত। অভাগিনী, প্রেমমুগ্ধা, অবলা বিধবা কি করিবে? সে প্রাণপণে বিশুষ্ক কণ্ঠ চাপিয়া রাখিল। কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া বিদীর্ণ হইয়া যা'ক, তথাপি সে সাগরশোষিণী তৃষ্ণা মিটাইতে চাহে না। মহাকবি কালিদাস "অভিজ্ঞান-শকুন্তল" নাটকে বলিয়াছেন—"আবাধ্যন্তে মনসিজমপি ক্ষিপ্তকালাঃ কুমার্য্যঃ!"—কুমারীরা সময়ক্ষেপ করিয়া আপনারা ত দুঃখ পায়ই, উপরন্তু মদনকে পর্য্যন্ত কষ্ট দেয়। কথায় বলে, "বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না।" অমর কবি এক স্থলে নিজেই বলিয়াছেন—"নব বধূর মত মুখ ফোটে ফোটে, ফোটে না।" বাস্তবিক চতুরা যুবতীর মত সে যে প্রেমের খেলা খেলিতেছিল বা ছলনাময়ী বিলাসিনীর মত নিজের কদর বাড়াইবার জন্য সোহাগের ভাণ

করিতেছিল, তাহা নহে। তাহার ঐ "না না" করার মধ্যে কোন অভিসন্ধি বা কোনপ্রকার ভাণ ছিল না। নববধূর লজ্জা, বিধবার সংযম, উপকৃতের কৃতজ্ঞতা, প্রণয়ের নিঃস্বার্থতা আর হৃদয়ের সারল্যই বরং উহাতে ছিল।

প্রাণের দেবতাকে কুন্দ কাড়িয়া লইতেছে—ইহা সূর্য্যমুখী সহ্য করিবে কেন? কুন্দের উপর সূর্য্যমুখী ইদানীং তেমন প্রসন্নাও ছিল না, বরং মনে মনে প্রবল তাচ্ছিল্য, অব্যক্ত ঈর্ষ্যা ও প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষই পোষণ করিত। তাচ্ছিল্য, ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ ও ক্রোধ অনেক সময়ে অজ্ঞাতসারে মানুষকে অনেক অকার্য্য করাইয়া লয়। মানুষ ভাবে, সে বিচার করিয়া ন্যায্য কার্য্যই করিতেছে। সূর্য্যমুখীও হীরার মুখে শুনিবামাত্র কুন্দকে ভ্রষ্টা বলিয়া গৃহ হতে তাড়াইয়া দিল। স্থিরবুদ্ধি সূর্য্যমুখী কুন্দকে অবশ্য ভ্রষ্টা-বিশ্বাসেই তাড়াইয়া দেয়, কিন্তু তাহার মধ্যে ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ ও ক্রোধ যে অজ্ঞাতসারে কিছু না কিছু সহায়তা করিয়াছিল, তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি। এইজন্যই সূর্য্যমুখী, কুন্দ চলিয়া যাওয়ার পর হইতেই গুমরাইয়া গুমরাইয়া মরিতেছিল, শেষে নগেন্দ্রনাথের নিকট নিজের অন্যায় স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিতেও কুণ্ঠিতা হয় নাই।

গভীরা রাত্রি। কুন্দ একবস্ত্রেই দত্তগৃহ ত্যাগ করিল। গৃহত্যাগ করিয়া সে যে কোন্ আশ্রয়ে যাইয়া উঠিবে, তাহা সে জানে না। তখন অভাগী নগেন্দ্রেরই শয়নকক্ষের নিম্নতলে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার দৃষ্টি তখন বাতায়নস্থ আলোকের প্রতি স্থিরনিবদ্ধ। অকস্মাৎ বাতায়নের আলোকপথে চিত্রিত নগেন্দ্রনাথের মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল। সঙ্গেসঙ্গে কাল

পেচকের বিকট চীৎকার। কুন্দ কাঁপিয়া উঠিল। কি ভাবিয়া তখনই নগেন্দ্রনাথ গবাক্ষদ্বার বন্ধ করিয়া সরিয়া গেল। কুন্দ তখনও সেই গবাক্ষতলে দাঁড়াইয়া আছে। তারপর মেঘের গর্জ্জন, বাতাসের হুহুঙ্কার, বিদ্যুতের চমকানি, ঝড়বৃষ্টির তাণ্ডব নর্ত্তন। কুন্দ আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না, ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে অন্ধকারে পথ চলিতে লাগিল।

কুন্দের হৃদয়ের মধ্যেও বাহ্যপ্রকৃতির এই দারুণ সঙ্ঘর্ষ— সেখানেও জমাট অন্ধকার। সেই মেঘের গর্জ্জন, সেই বাতাসের হুড়াহুড়ি, ঝড়বৃষ্টির দাপাদাপি আর কাল পেচার বিকট চীৎকার! কুন্দের সেই জমাট আঁধারেভরা হৃদয়ের মধ্যে নগেন্দ্রের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি এক একবার আঁধার ভেদ করিয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

নিয়তির নিষ্ঠুর তাড়নায়, ঝড়বৃষ্টির মধ্যে কুন্দ হীরাদাসীর আশ্রয়ে গিয়া উঠিল। স্বার্থসিদ্ধির আশায় হীরা তাহাকে গৃহের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিত, দত্তগৃহের কোন সংবাদই তাহাকে দিত না।

কুন্দের গৃহত্যাগে নগেন্দ্র দেশত্যাগের সঙ্কল্প করিতেছে শুনিয়া সূর্য্যমুখী প্রমাদ গণিল। "তোমাতে আর সুখ নাই"; "কুন্দকে পাই তবে দেশে ফিরির" পতির মুখে এই কথা শুনিয়া সতী সূর্য্যমুখী স্থির করিল—কুন্দকে পাওয়া যাইলে পতির সহিত বিবাহ দেওয়াইবে; নিজের স্বার্থসুখ বিসর্জ্জন দিয়া পতির তৃপ্তি সাধন করিবে।

তখন সতী কায়মনোবাক্যে ইষ্টদেবতার নিকট কুন্দের প্রত্যাগমন-বরই প্রার্থনা করিল। সতীর প্রার্থনা কখন বিফল হয় না। এদিকে—কুন্দও নগেন্দ্রের অদর্শনজনিত দুঃখ সহ

করিতে না পারিয়া দত্তগৃহে ফিরিয়া আসিল। এক-জাতীয় ভালবাসা আছে—যাহা মান, অপমান, গর্ব্ব ও অভিমানকে আমলই দেয় না। কুন্দের ভালবাসাও ঐ-শ্রেণীর। নচেৎ গৃহ হইতে বিতাড়িতা হইয়া, আশ্রয় পাইবার কোন ভরসা না পাইয়াও বিনা-আহ্বানে আবার সেইস্থানে সে ফিরিয়া আসিবে কেন?

নগেন্দ্রের সহিত কুন্দের বিবাহ হইয়া গেল। সূর্য্যমুখী বিদীর্ণপ্রায় বক্ষটি চাপিয়া রাখিয়া, ম্লান মুখে হাসিটি ফুটাইয়া দম্পতীকে বরণ করিল। ধনীর গৃহে বলিয়াই এ বিবাহ, বিনা-বাধায় সম্পন্ন হইল। বাহিরেও কলরব বড় হইল না, অন্তঃপুরে ত তাহা একেবারেই আত্মপ্রকাশ করিতে পাইল না।

বাস্তবিক সূর্য্যমুখী যখন নিজ অধিকারের দাবী ত্যাগ করিয়া হাসিমুখে অংশ দিতেছে, প্রাণের দেবতা নগেন্দ্র যখন আদর করিয়া তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইতেছে, তখন সে দান কেন কুন্দ না লইবে, স্নিগ্ধ শীতল বক্ষে আশ্রয়লাভের সৌভাগ্য কেন সে ত্যাগ করিবে? একেই প্রেমরসার্দ্রা, আপত্তি করিবে কি? এতই সে দুর্ব্বলা, আপত্তির শক্তিই বা তার কোথায়? জীবনের সাধনা আজ মূর্ত্তিমতী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আকাঙ্ক্ষা আজ বরদাত্রী হইয়া সম্মুখে আসিয়াছে—সংসারিণী কুন্দ কেন হাসি-মুখে অভ্যর্থনা না করিবে? সংসারিণী মানবী সংযমে অনভ্যস্তা, অশিক্ষিতা ও সরলা—যাহা করিবার, সে তাহাই করিল। প্রেম ও মোহের টানে স্রোতো-চালিত তৃণের মত ভাসিয়াই চলিল। আকাশের চাঁদ আজ ধরা দিয়াছে, এতদিনের অসম্ভাবিত উচ্চ আশা পূর্ণ হইয়াছে, আজ তার কি আনন্দের দিন!

জানিবে কিরূপে, যাহাকে সে জীবনের অবলম্বন ভাবিয়া হাসি-মুখে অগ্রসর হইতেছে—সে আশ্রয়তরু নহে, বিষবৃক্ষ। কেমনেই বা সে বুঝিবে, যে আকাঙ্ক্ষাকে সে প্রাণের সঙ্গিনীর মত বক্ষের উপর টানিয়া লইতেছে—সে সখী নহে, প্রাণঘাতিকা সর্পী।

নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখী, কুন্দের আশ্রয়স্থল, গুরু ও অভিভাবক। তাহারা যখন যে ব্যবস্থা করিয়াছে, কুন্দ এতদিন তাহাই মানিয়া আসিয়াছে; এখনই বা না মানিবে কেন? অস্বীকার করিবার তাহার সাধ্যই বা কি? বিশেষ, ইহা তার জীবনের আকাঙ্ক্ষিত। সুখস্বপ্নে বিবশা কুন্দ অন্য চিন্তা বড় করিল না, ভিতরে একটি হর্ষপুলকময় প্রেমপূর্ণ হৃদয়টি লইয়া নগেন্দ্রের পার্শ্বে নববধূ হইয়া বসিল। বাহিরে তাহাকে হৃদয়হীনা পাষাণী বলিয়াই দেখা যাইত। লোকেও তাহাই ভাবিল।

কুন্দ নগেন্দ্রনাথকে পতিরূপেই পাইল, পাইয়া চরিতার্থও হইল। সে ধর্ম্ম, সমাজ বড় চিনিত না; বিবেক সংস্কারের ধার বড় ধারিত না। সে জানিত নগেন্দ্রকে, ভালবাসিত নগেন্দ্রকে; তাহার ইহপরকাল সকলই নগেন্দ্র। কুন্দ হাতে স্বর্গ পাইল। ভাবিল "এ সুখের বুঝি তল নাই।"

কুন্দ সে স্বর্গসুখ ভোগ করিতে পাইল না। এতদিনের সাধ তার মিটিয়াও মিটিল না। প্রাণের তৃষ্ণা, মনের ক্ষুধা বা প্রেমের লালসা যেমন, তেমনই রহিল। সে যাহা পাইলে আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হইবে মনে করিয়াছিল, তাহা পাইল, কিন্তু কৈ, আকাঙ্ক্ষা ত পূর্ণ হইল না। বিবাহের পরই সূর্য্য-

মুখী গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে কুন্দেরও স্বপ্ন ভাঙ্গিল। সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগে কুন্দ বড়ই মর্ম্মপীড়া পাইল।

কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রের তীব্র ভালবাসা ও প্রখর উন্মাদনা সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইল। সূর্য্যমুখীকে কোথাও পাওয়া গেল না। কুন্দকেই সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগের কারণ ভাবিয়া নগেন্দ্রেরও তাহার প্রতি বিতৃষ্ণাভাব জাগিয়া উঠিল। কি সুচিন্তা, কি কুচিন্তা, নিরন্তর অনুস্মরণে প্রবল ভাব ধারণ করে। এক্ষেত্রে সূর্য্যমুখীর প্রতি নগেন্দ্রের প্রেম কুন্দের রূপযৌবন-ভোগলালসায় আবৃত ছিল মাত্র। সূর্য্য-মুখীর বিরহে সে আবরণ খুলিয়া গেল। অমর কবিই বলিয়া গিয়া-ছেন—সূর্য্যমুখীর প্রতি নগেন্দ্রের প্রগাঢ় ভালবাসা—কুন্দনন্দিনীর ছায়ায় আবৃত ছিল। এখন সূর্য্যমুখীকে হারাইয়া নগেন্দ্রনাথ সে ভালবাসা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল। যতক্ষণ সূর্য্যদেব অনাচ্ছন্ন থাকেন ততক্ষণ তাহার কিরণে সন্তাপিত হই, মেঘ ভাল লাগে, কিন্তু সূর্য্য অস্ত গেলে বুঝিতে পারি—সূর্য্যদেবই সংসারের চক্ষু। সূর্য্য বিনা সংসার আঁধার।

নগেন্দ্রনাথের প্রতি কুন্দের প্রেম অতলস্পর্শ সাগরের মত গভীর ছিল। তারাচরণের সহিত বিবাহের পূর্ব্বে সে প্রেম অনাস্বাদিতরস মধুর মত মধুর ছিল। কিন্তু বিবাহ হওয়ার পর সেই প্রেম আমাদের নিকট আর পবিত্র বলিয়া প্রতীত হইতে পারে না। তবে যদি ধর্ম্ম, সমাজ, জাতীয়তা, বিবেক এবং সংস্কারের দিকে না চাহিয়া কেবল হৃদয়ের দিক্ দিয়া

বিচার করা যায়, তাহা হইলে বলিতে পারা যায়—এ প্রেম অমৃতের মত সুস্বাদ, পুষ্পের মত কোমল, হাসির মত স্বচ্ছ।

কুন্দের প্রেমপ্রকাশের ভাষা ছিল না। নগেন্দ্রকে সম্মুখে পাইলে সে এমন আপনাকে ভুলিয়া যাইত যে, তাহার মুখে কোন কথাই ফুটিত না। এই প্রেমে মৌন, রসালাপে মূক, মিলনে আত্মহারা মূর্ত্তিটি নগেন্দ্রের নিকট পাষাণপ্রতিমা বলিয়াই প্রতীত হইল। উপরে যে প্রেম ফুটে না—তাহার গভীরতা উপলব্ধি করা নগেন্দ্রের সাধ্যায়ত্ত ছিল না। কুন্দের "সেই বাসি বৈ কি!" "বরাবরই বাসি" এই সংক্ষিপ্ত সরল কথায় নগেন্দ্র তৃপ্তি হইল না।

সূর্য্যমুখীকে আর পাওয়া গেল না। কুন্দকেই সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগের কারণ ভাবিয়া নগেন্দ্র কুন্দের প্রতি আর ফিরিয়া চাহিল না, বরং উপেক্ষার ভাবই দেখাইতে লাগিল। কুন্দ অন্তরে বড় আঘাত পাইল। এ উপেক্ষা তাহার প্রাণে বড় বাজিল। অভাগিনী বুঝিল—সকল সুখের সীমা আছে। সে আপন মনে কাঁদিল। সান্ত্বনার আশায় কমলমণির নিকটে যাইলে "কাজ আছে" বলিয়া সে উঠিয়া গেল। সান্ত্বনার পরিবর্ত্তে বেদনা। আঘাতের উপর আঘাত!

গৃহদাহে সূর্য্যমুখীর মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া নগেন্দ্র গৃহে ফিরিয়া আসিল। সূর্য্যমুখীর শোকে মুহ্যমান নগেন্দ্র কুন্দের সহিত একবার সাক্ষাতও করিল না, মুখের কথায় একবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসাও করিল না। কর্ত্তব্যবোধেও যেটুকু পাওয়া

উচিত ছিল, সেটুকুও কুন্দ নগেন্দ্রের নিকট পাইল না। কুন্দ সমস্ত রাত্রি ধরিয়া অনেক কান্না কাঁদিল ; পরিশেষে ভাবিল :—

"এখন আর কোন্ সুখের আশায় প্রাণ রাখি" শস্যশ্যামলা পৃথিবী তখন তাহার নিকট রুক্ষ মরুভূমি। আমোদচঞ্চল নূতন জীবন তখন তাহার কাছে—বীভৎস শ্মশানস্থল।

চারি বৎসর পরে কুন্দ আবার তাহার মাতাকে স্বপ্নে দেখিল। মাতার সেই ভবিষ্যদ্বাণী আর সে অবিশ্বাস করিতে পারে না। জীবনের সকল সুখসাধই ত তাহার মিটিয়াছে, এইবার সে মাতার সঙ্গে যাইতে চাহে। "এস"—বলিয়া মাতা চলিয়া গেল। স্বপ্নভঙ্গে কুন্দ দেবতার নিকট ভিক্ষা চাহিল—"এইবার স্বপ্ন সফল হউক।"

দত্তগৃহে মঙ্গলসূচক শঙ্খধ্বনি ও উলুউলু রব উত্থিত হইল। কুন্দও অমনই হীরার আনীত বিষের মোড়ক চুরি করিয়া খাইয়া ফেলিল। কুন্দ পূর্ব্বেই জানিয়াছে—নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর, নগেন্দ্রে তাহার কোন অধিকার নাই। তবে সে কেন তাঁহাদের বাধাস্বরূপ হইয়া থাকিবে, সূর্য্যমুখীর সুখের পথে কেন কাঁটা হইয়া রহিবে ?

সূর্য্যমুখী কমলমণির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া দেখে—কুন্দ করিশুণ্ড-ছিন্ন লতিকার মত শয্যায় পড়িয়া আছে। সে হিরণ্ময়ী প্রতিমার মুখখানি মৃত্যু-যন্ত্রণায় কালিমাময়। নগেন্দ্রনাথ তখন নিজকৃত কর্ম্মের ফল বুঝিয়া অনুতাপ-বিবর্ণ মুখে কুন্দের পার্শ্বে উপবিষ্ট।

মরণের মুখে অর্দ্ধপথে গিয়া অর্দ্ধস্ফুট কুন্দ ফুটিয়াছে।

তাহার অপরিমিত প্রেম আজ ভাষা পাইয়াছে; তাই সে অন্তিম-কালে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারিল—

"কাল যদি তুমি আসিয়া একবার কুন্দ বলিয়া ডাকিতে, কাল যদি একবার আমার নিকট এমন করিয়া বসিতে, তবে আমি মরিতাম না ; তোমাকে পাইয়া আমার তৃপ্তি হয় নাই, আমি মরিতাম না।"

নগেন্দ্রনাথকে জানুর উপর ললাট রক্ষা করিয়া নীরবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া কুন্দ কহিল ;—কুন্দ আজ বড় মুখরা, আর ত সে স্বামীর সঙ্গে কথা কহিবার দিন পাইবে না—"ছিঃ, তুমি অমন করিয়া নীরব হইয়া থাকিও না। আমি তোমার হাসিমুখ দেখিতে দেখিতে না মরিলাম, তবে মরণেও সুখ হইবে না।"

কুন্দ অতৃপ্তার ন্যায় পুনরপি ক্লিষ্ট নিঃশ্বাস ছাড়িয়া কহিতে লাগিল—"আমি তোমাকে দেবতা বলিয়া জানিতাম। সাহস করিয়া কখন মুখ ফুটিয়া কথা কহি নাই।"

কুন্দ স্বামীর পদযুগল-মধ্যে মুখ লুকাইল। তার মুখে আর কোন কথা ফুটিল না। পদতলে মুখ রাখিয়া অপরিস্ফুট কুন্দ পরিস্ফুট হইয়া জীবন ত্যাগ করিল। স্বর্ণপ্রতিমা অকালে বিসর্জ্জন হইয়া গেল।

আমাদের চক্ষুতে কুন্দের পাপ দুইটি। একটি তাহার বিবাহ অপরটি তাহার আত্মহত্যা। বিধবা-বিবাহ এবং আত্মহত্যা দুইটিই হউক পাপ আত্মহত্যার দৃশ্যটি কিন্তু বড় করুণ—বড় মর্ম্মস্পর্শী। এই দৃশ্যের আপাতমধুর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধা ও আত্মহারা হইয়া কত ক্ষুদ্রপ্রাণা অবলা ইহাকে গৌরবের কার্য্য

ভাবিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে। এজন্য প্রত্যক্ষভাবে কবিকে দোষ দেওয়া চলে না। কবি ত কুন্দের এই কার্য্যটি দুর্ব্বলতা এবং অবিমৃষ্যকারিতা বলিয়া বুঝাইয়া গিয়াছেন।

বিবাহের মন্ত্রশক্তির বিকাশ কুন্দের জীবনে একেবারেই দেখা যায় নাই। ভালবাসার শক্তি বিশ্ব-বিজয়িনী হইয়াই তাহার জীবনে আধিপত্য করিয়া আসিয়াছে। বিধবা-অবস্থাতে, এমন কি মরণ-সময়েও পূর্ব্ববিবাহের মন্ত্রশক্তির কোনরূপ স্পন্দনই তাহার জীবনে ফুটিয়া উঠে নাই।

কুন্দের এই আত্মহত্যা তাহার ইহকৃত কর্ম্মেরই ফল। ইহকৃত কর্ম্ম দেখিতে পাইলে গত জন্মের কর্ম্ম-অনুসন্ধানের আর আবশ্যক পড়ে না। একদিকে দুঃখ বেদনা সহ্য করিতে না পারার জন্যই কুন্দের এ মরণ; কাজেই এ আত্মহত্যা। অপরদিকে ইহাই আবার পরের মঙ্গল-মন্দিরে আত্মবলি; আত্মহত্যা নহে। বলা বাহুল্য, সূর্য্যমুখীর মরণ-সংবাদ কুন্দের কর্ণে পৌঁছে নাই।

এই আত্মহত্যার মূলে প্রবল অভিমান ও দুঃসহ বেদনা ছিল, এইজন্য ইহা পাপ। আবার নগেন্দ্রসূর্য্যমুখীর মিলনে সে বাধারূপ কণ্টক হইয়া থাকিতে চাহে না—এই নিঃস্বার্থভাবও তাহার ছিল। একারণে ইহা পাপের প্রায়শ্চিত্তও বটে। একটি পাপ —অপরটি পাপনাশক প্রায়শ্চিত্ত। একই মরণরূপ কার্য্য অংশতঃ পাপ, অংশতঃ প্রায়শ্চিত্ত। এটি সম্ভব কিনা, এবং কি উপায়ে সম্ভব—তদ্বিষয়ে দার্শনিক জটিল তর্ক এ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য নহে।

কুন্দের এই মরণ, মরণকালীন অতৃপ্ত হৃদয়ের বাণী নগেন্দ্রের সারা জীবনে গাঁথা রহিয়া গেল। অমর কবি জানাইয়াছেন, "কুন্দের আধিক্লিষ্ট মুখের বিদ্যুন্নিন্দিত হাসি নগেন্দ্রের প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত অঙ্কিত ছিল"।

চিত্তের অসংযমের ফলে যে পাপের উৎপত্তি, তাহার ফল সাধারণতঃ ইহজন্মেই ঘটিয়া থাকে। ইহজন্মে ফলভোগ অবশ্য না হইলে পরলোকে বা জন্মান্তরেই ভোগ হইবে। কুন্দকে স্বকর্ম্মেরই ফল ভোগ করিয়া যাইতে হইল। আর নগেন্দ্রও কৃতকর্ম্ম ভোগ করিবার জন্যই বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়া রহিল। একজন অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া মর্ত্ত্য ছাড়িয়া গেল। অপর জন দুঃসহ অনুতাপ লইয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিল।

নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখীর মিলনকে আর পূর্ব্বমত মিলন বলা চলে না। উভয়ের মধ্যস্থলে কুন্দের অশরীরিণী ছায়া মাঝে মাঝে দেখা দিয়া যাইত। দম্পতীর মিলন-সঙ্গীতের অন্তরালে কুন্দের বিষাদভরা কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে অস্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যাইত। এ মিলন যে অভিশপ্তবৎ—এজন্য বিষবৃক্ষ মিলনান্ত উপন্যাস হইয়াও ঠিক মিলনান্ত নহে।

কুন্দনন্দিনী মরণের মুখে আপনাকে ফেলিয়া দিল বটে, সঙ্গে সঙ্গে অনেককে অনেকরকমে শিক্ষা দিয়া গেল। মরণের স্মৃতি যে কেবল নগেন্দ্রের জীবনে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা নহে; অনেকেরই জীবনে অল্প বিস্তর ছায়াপাত দেখা গিয়াছে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

কপালকুণ্ডলা।

কপালকুণ্ডলা দুর্গার একটি নাম। ভবানীর কন্যা, ভবানীর সেবিকা, ভবানীর পাদপদ্মে সমর্পিতা, তাই কপালকুণ্ডলা নাম। ভবভূতির "মালতিমাধবে" অঘোরঘণ্টের এক শিষ্যা, ভীষণা ভৈরবী কপালকুণ্ডলার পরিচয় আছে। সে ভৈরবী, পিশাচিনী; এ যোগিনী, দেবী। সে ভীষণ-প্রকৃতি; এ দয়াবতী। ভবানীর আমরণ উপাসিকা বলিয়াই হউক, ভৈরবীরূপে কল্পিত বলিয়াই হউক, আর শক্তিপূজার বলিরূপে রক্ষিতই হউক; এ নাম সার্থক।

বলা বাহুল্য, তান্ত্রিকের পালিতা কন্যা বলিয়া তান্ত্রিকের প্রদত্ত কপালকুণ্ডলা নাম—ইহা সাধারণ কথা। কপালকুণ্ডলা মহাকবি বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি কথা, উপাখ্যান, কাব্য বা উপন্যাস গ্রন্থ। ইহা নায়িকা-প্রধান। কপালকুণ্ডলাই এ গ্রন্থের নায়িকা। অলঙ্কার শাস্ত্রের লক্ষণগুলি ঠিক না মিলিলেও ইহাকে মুগ্ধা নায়িকার মধ্যেই ফেলিতে হয়। বাস্তবিক "প্রথমাবতীর্ণ-যৌবনা," এমন সরলা মুগ্ধা বালা, "মুগ্ধা নায়িকা" বলিয়া না—এ এক অপূর্ব্ব নূতন প্রকারের মুগ্ধা নারী। এই অপূর্ব্ব মুগ্ধা নায়িকাকে সৃষ্টি করা, এই অত্যাশ্চর্য্য অসংসারিণী প্রকৃতি-শিশুটির চিত্র প্রদর্শন করাই এই কথারচনার প্রধান উদ্দেশ্য—তজ্জন্যই নায়িকার নামে এই কথাগ্রন্থখানির নামকরণ হইয়াছে।

সংস্কৃত কথাগ্রন্থও "কাদম্বরী" ও "বাসবদত্তা" এই নায়িকার

নামেই পরিচিত। সংস্কৃত নাট্যগ্রন্থও "রত্নাবলী," "অভিজ্ঞান শকুন্তল," "প্রভাবতী," "কর্পূরমঞ্জরী," "চন্দ্রকলা" ও "কুন্দমালা" আর বর্ত্তমান গ্রন্থকারেরও "দুর্গেশনন্দিনী," "মৃণালিনী," "দেবী-চৌধুরাণী," "ইন্দিরা," "রজনী," "রাধারাণী," "ভ্রমর," আর "কপাল-কুণ্ডলা" প্রভৃতি পুস্তক নায়িকার নামেই প্রসিদ্ধ। বাঙ্গালা কাব্য "পদ্মিনী," "রঙ্গমতী" (নবীন সেনের), "ব্রজাঙ্গনা," "চিত্রাঙ্গদা" (নাটক হইলেও কাব্য) প্রভৃতি কাব্য নায়িকার নামেই অভি-হিত। কপালকুণ্ডলা-নায়িকাকেই অবলম্বন করিয়া প্রধান-ভাবে রসটিকে ফুটান হইয়াছে বলিয়া কপালকুণ্ডলা নামে ইহার পরিচয় সার্থক। "কপালকুণ্ডলামধিকৃত্য যা কথা বর্ত্ততে সা কথা কপালকুণ্ডলা" কপালকুণ্ডলাকে অধিকার করিয়া যে কথা প্রস্তাবিত, তাহাই কপালকুণ্ডলা গ্রন্থ। এস্থানে নামের সহিত গ্রন্থের একাত্মতা হইয়াছে।

কাহারও কাহারও মতে, এই গ্রন্থখানি কবির শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। "ভিন্নরুচির্হিলোকঃ" যাহার যেমন রুচি, তিনি সেই-মতই বলিবেন। তবে ইহা সত্য—কপালকুণ্ডলা চরিত্রটি কবির এক অদ্ভুত সৃষ্টি। এ যেন স্বপ্ন-গঠিত, স্মৃতি দিয়া নির্ম্মিত, চন্দ্রকিরণ নিঙ্গড়িয়া রচিত। এ যেন শিশুর হাস্য, বালিকার স্নেহ, পূজারিণীর অহেতুকী ভক্তি। এ যেন স্বর্গের পারিজাত, দেবতার অমৃত, গোলকের প্রেম। ইহা বুদ্বুদের মত ফুটে, যূথিকার মত দুলে, আর শেফালির মত ঝড়িয়া পড়ে। এ এক সঞ্চারিণী জীবন্ত জ্যোতি—যেস্থান দিয়া যায়, সেইস্থানটি আলোময় হইয়া উঠে। ইহার স্বাভাবিক দাহিকা শক্তি নাই, কিন্তু যে-ই ইহার অপব্যবহার

করে, ইহার দ্বারা নিজ লালসার তৃপ্তি করিতে চাহে, ইহাকে রঙ্গিনীরূপে আয়ত্ত করিতে চাহে, সে-ই কিন্তু পুড়িয়া মরে, তা'সে ভীমকায় কাপালিকই হউক আর সৌম্যদর্শন সাংসারিকই হউক। স্পর্শের যে সামগ্রী নহে, কেবল দূর হইতে দেখিবারই বস্তু—তাহাকে স্পর্শ করা, দলিত করা, চক্ষুর উপর দাঁড় করাইয়া রাখা অমার্জ্জনীয় অপরাধ। ফল তার কখনও ভাল হয় না, হইলও তাই। দর্শনে যে কুণ্ঠিত হয়, স্পর্শে যে নুইয়া পড়ে, সে ফুলটি অতলে ভাসিয়া গেল। অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ কাপালিক ভগ্নহস্ত, ব্যর্থকাম এবং পরিশেষে জীবন্মৃত হইয়া রহিল। নবকুমারও অতৃপ্ত বাসনারাশি বক্ষে করিয়া উন্মত্তের মত সেই অতলে ঝাঁপ দিল।

নায়ক নবকুমার দয়াবৃত্তির অনুপ্রেরণায় কাষ্ঠাহরণ করিতে গেল; ফলস্বরূপ দয়াময়ী বনদেবীর সাক্ষাৎ মিলিল। কপালকুণ্ডলাই সে বনদেবী, "গম্ভীরনাদি-বারিধিতীরে সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে অদৃষ্ট রমণীমূর্ত্তি।" সে যেন সাগরহৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণরেখা, সে যেন বিপন্ন উদ্ধারের জন্য সমাগতা মূর্ত্তিমতী করুণা। বিপন্নের প্রতি করুণা রমণীর একটি বিশেষ গুণ। বিশেষতঃ কাপালিকের নৃশংস কার্য্যের মধ্যে থাকিয়া, সংসারের উপলবিষম পথের সহিত পরিচিত না হইয়া এই স্বভাব-গুণ তাহার আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

করুণাময়ী কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে বিপন্নের প্রতি প্রথম সহানুভূতি জাগিল, "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ।" তার পরেই সেই সহানুভূতিটি দয়ারূপে ফুটিয়া উঠিল; "আইস" বলিয়া সেই

মন্দানিলসঞ্চালিত শুভ্র মেঘমালা নবকুমারকে কুটীরে পৌঁছাইয়া দিল। সে দয়ার সঙ্গে একটি উদ্বেগও ছিল,—নতুবা কপাল-কুণ্ডলার সেই নবকুমারের মুখে ন্যস্ত অনিমেষ দৃষ্টি দেখিয়া আমরাও বলিতে পারিতাম—

নিবারিতনিমেষাভির্নেত্রপঙ্‌ক্তিভিরুন্মুখঃ।
নবামিন্দুকলাং লোকঃ কেন ভাবেন পশ্যতি॥

নবকুমারের মনে হইল—এ যেন তারই হৃদয়ের বীণা বাজিয়া উঠিয়াছে। এ যেন সুখময় সঙ্গীতপ্রবাহ সংসার-সাগরের মাঝ-খান দিয়া বহিয়া যাইতেছে। এ যেন হর্ষবিকম্পিত পরিচিত ধ্বনি বাতাসে সাগরনাদে ভাসিয়া চলিয়াছে। সে বীণা থামিয়া গেল; সে সঙ্গীত সে ধ্বনি আর শ্রুত হইতেছিল না। তখন নবকুমার করতলে মস্তক রাখিয়া ভাবিতে লাগিল—একি দেবী—মানবী—না, কাপালিকের মায়া।

তখন সন্ধ্যালোক অন্তর্হিত হয় নাই,—কাপালিক অগ্রে অগ্রে, নবকুমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছে। বিপন্নের প্রতি দয়া এইবার ব্যাকুলতায় পরিণত হইল। সে আকুলতাভরা বাণী—"যাইও না,—ফিরিয়া যাও—পলায়ন কর" এই কথা বার বার তিনবার বলা অন্তরে ব্যাকুলতারই সূচক। নবকুমার ফিরিল না, পলায়ন করিল না,—তখন সেই ব্যাকুলতা কপালকুণ্ডলাকে উদ্‌ভ্রান্তা করিয়া তুলিল। কাপালিক পার্শ্বে আছে—সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া, কাপালিককে অত ভয়—তাহাও তুচ্ছ করিয়া উদ্‌ভ্রান্তা বালা তীরের মত ছুটিয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেল—

"এখনও পলাও, নরমাংস না হইলে তান্ত্রিকের পূজা হয় না, তুমি কি জান না ?"

কি ক্রোধাদি কুবৃত্তির দ্বারা, কি দয়াদি সুবৃত্তির দ্বারা মানব অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে যে বীরত্ব প্রদর্শন করে, সে যুদ্ধবীর। দয়ার ক্ষেত্রে যে বীরোচিত ভাব দেখাইতে পারে, সে দয়াবীর। কাপালিকের অজ্ঞাতসারে খড়্গ লইয়া পলায়ন, প্রাণভয় তুচ্ছ করিয়া নবকুমারের বন্ধন মোচন—এস্থানে দয়া-বীরত্বের কার্য্য। দয়াবীর ব্যতীত এই কার্য্য কেহ করিতে পারে না। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে বীররসের প্রস্তাবে দয়াবীর, দানবীর, কর্ম্মবীর ও যুদ্ধবীর—এই চারিপ্রকার বীরের কথা বলা হইয়াছে। অমাবস্যার ঘোরান্ধকার যামিনীতে ঊর্দ্ধশ্বাসে বনমধ্যে প্রবেশ—এস্থানে বীররসের স্থায়ী ভাব উৎসাহেরই কার্য্য। বড় রকমের একটি উৎসাহের প্রেরণায় তাই সে আজ নবকুমারকে লইয়া গভীর বনপথে ধাবমানা, তাই সে আজ অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্তা। এই উৎসাহই স্থায়ীভাব, ক্ষণিক বা ব্যভিচারী ভাব নহে। স্থায়ী বলিয়াই নবকুমারকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া কপালকুণ্ডলা নিশ্চিন্ত ও তৃপ্ত হইল।

নবকুমারকে রাখিয়া প্রকৃতি-শিশু সমুদ্রতীরে কাপালিকের নিকটেই ফিরিবার সংকল্প করিল। উৎসাহটি ক্ষণিক বা ব্যাভিচারী হইলে অধিকারীগৃহে আসার পরই সে উৎসাহ তাহার নিভিয়া যাইত। কপালকুণ্ডলা নির্ভীক, আপনার প্রণের ভয় সে আদৌ করে নাই। নচেৎ সে কাপালিকের নিকট ফিরিবার উদ্যোগ

করিত না। অথচ কাপালিকের নিকট ফিরিয়া গেলে তাহার যে রক্ষা নাই, তাহাও সে বিলক্ষণ জানিত। উপায়ই বা কি ?

কালিকার উপর কপালকুণ্ডলার বড় ভক্তি। পূজক অধিকারী "এই পথিকের সঙ্গে দেশান্তরে যাও" এই বলিয়া মায়ের অনুমতি আনিতে গেলেন। পুষ্পপাত্র হইতে একটি অচ্ছিদ্র বিল্বপত্র মন্ত্রপূত করিয়া মায়ের পাদপদ্মে অর্পণ করিলেন। ভক্তের প্রদত্ত বিল্বপত্র মাতা গ্রহণ করিলেন। কপালকুণ্ডলা বুঝিল, ইহাতে তাঁহার মঙ্গলই হইবে। জগন্মাতা শিবের বিবাহিতা, অতএব বিবাহ স্ত্রীলোকের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য; পক্ষান্তরে কাপালিকের নিকট প্রত্যাবর্ত্তনও বিপজ্জনক ;—নানাদিক্ ভাবিয়া অধিকারীর কথায় কপালকুণ্ডলা স্বীকৃতা হইল। আর নবকুমারের প্রাণরক্ষা করিয়া তাহার উপর একটি করুণার এবং সমবেদনার ভাবও তাহার জাগিয়াছে। সেটিও একটি আকর্ষণ। হউক সূক্ষ্ম, হউক অব্যক্ত, তথাপি তাহা আকর্ষণ।

কপালকুণ্ডলা প্রকৃতির দুহিতা। যদি সে অরণ্যবাসিনী, কালীভক্তা, অসংসারিণী না হইত, কিম্বা যদি সে "রক্তমাংসময় হৃদয়-সমন্বিতা," যৌবনবতী সাধারণ রমণীর মতন হইত, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই বলিতে পারিতাম, নবকুমারের মত সুপুরুষ-সংস্পর্শে তাহার নারীহৃদয় নিশ্চয়ই স্পন্দিত হইয়া উঠিত, এবং সে নিশ্চয়ই আপনার প্রাণমন নবকুমারের পদে অর্ঘ্যস্বরূপ অর্পণ করিত। কপালকুণ্ডলা "কপালকুণ্ডলা" বলিয়াই রমণীহৃদয়ের সাধারণ ভাবটি তাহাতে দেখা গেল না। শকুন্তলা বা মিরণ্ডা, এমনকি মহাশ্বেতায় যাহা দেখা গিয়াছিল, কপালকুণ্ডলায় তাহা

দেখা গেল না। রমণীর হৃদয়ের স্বাভাবিক ভাব এস্থানে ফুটিল না। নবানুরাগই এস্থানে স্বাভাবিক ভাব। যৌবনের দুরতিক্রম প্রভাব যাহাতে দেখা গেল না, সে কেমন নারী? এ যেন মর্ত্ত্যের নারী নহে; এ এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি! পরে, মন্ত্রের শক্তিতে একত্রে বসবাস করিয়াও কপালকুণ্ডলার হৃদয়-দর্পণে নবকুমারের ছায়াপাত দেখা যায় নাই; কাজেই সাংসারিক দৃষ্টিতে এবং সাধারণ বিচারে—সে যেন প্রাণহীনা, হৃদয়হীনা পাষাণী মানবী, বস্তুতঃ তাহাও নহে। যে নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া বিপন্নকে উদ্ধার করে, একাকিনী রাত্রে ঔষধ আনিয়া পতি-বিরহিতার সুখের জন্য স্বামীর অসন্তোষকে যে অগ্রাহ্য করে, পরিশেষে অপরিচিতার (পদ্মাবতীর) প্রার্থনায় যে পরের জন্য পতি, সংসার এবং বর্ত্তমান আশ্রয় পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃতা হয়, তাহাকে হৃদয়হীনা পাষাণী বলিব কিরূপে? এ যে চাঁদের আলো। প্রদীপের আলোর মত সাংসারিক কার্য্যে আইসে না বলিয়া ইহার উপযোগিতা অল্প কিসে? এ বন্য শিশুটি বিশ্বের উন্মুক্ত ময়দানেই ছুটাছুটি করিবে। এ বাঁধিয়া রাখিবার জিনিষ নহে। পিঞ্জরেই হউক, আর বড় করিয়া বেড়ার মধ্যেই হউক, ইহাকে বাঁধিয়া রাখিলে সে সুখী হইতে পারিবে না। মায়ের পাদপদ্মের ফুল পাদপদ্মেই থাক্ তাহাকে তুমি নিজের সেবার জন্য লইবে কেন? প্রকৃতির অকৃত্রিম শিশুটি, তাহাকে তুমি কৃত্রিম আবহাওয়ার মধ্যে আনিয়া গৃহাঙ্গনে রোপণ করিয়া রাখিবে কেন? যিনি কৃতঘ্ন সহযাত্রীদিগের জন্য মাথায় কাষ্ঠভার বহিয়াছিলেন, সেই নবকুমার কৃতোপকারিণীর জন্য অতুল রূপরাশি হৃদয়ে বহিতে

চাহিবেন, তাহাতে বৈচিত্র্য কি ? গোধূলিলগ্নে নবকুমারের সহিত কাপালিক-পালিতা সন্ন্যাসিনীর বিবাহ হইয়া গেল। যাত্রাকালেও কপালকুণ্ডলা স্বয়ং একটি বিল্বপত্র মাতৃপাদপদ্মে অর্পণ করিল, সে বিল্বপত্রটি পড়িয়া গেল ; ভক্তিপরায়ণা নিতান্ত ভীতা হইল। অধিকারী বুঝাইলেন, "পতিমাত্রই তোমার ধর্ম্ম। পতি শ্মশানে গেলে তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইবে।" কপালকুণ্ডলা ভয় ও ভাবনা লইয়াই পতিসহ যাত্রা করিল। এই বিল্বপত্র-চ্যুতি-ব্যাপারটি কাল ছায়ার মত কপালকুণ্ডলার চিত্তে চির অঙ্কিত রহিল। ননদ শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে কথোপকথনে পরে তাহাই পরিস্ফুট হইয়া দেখা দেয়।

পথিমধ্যে দোকানঘরের আর্দ্রমৃত্তিকায় কপালকুণ্ডলাকে একা বসিয়া থাকিতে দেখিলাম। নিবিড় কেশরাশি পশ্চাদ্‌ভাগ অন্ধকার করিয়া আছে। সে গৃহে একটিমাত্র ক্ষীণালোক প্রদীপ জ্বলিতেছে। চঞ্চলা হরিণীর মত যে সমুদ্রের তীরে তীরে ছুটাছুটি করিয়া আসিয়াছে, দোকানঘরের আর্দ্রমৃত্তিকার উপর বসিয়া থাকিতে তাহার ভাল লাগিবে কেন ? সাগরজলে জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি দেখায় যে অভ্যস্তা; প্রদীপের মিটমিটে আলো তাহার ভাল লাগিবে কেন ? কপালকুণ্ডলা দেখিতে পাইতেছিল না যে, সংসারের কালিমরাশি যেন পশ্চাদ্দিক্ হইতে তাহাকে স্পর্শ করিয়া আছে।

মতিবিবি যখন প্রদীপটি তুলিয়া কপালকুণ্ডলাকে অনিমেষ-লোচনে দেখিতেছিল, তখন কপালকুণ্ডলা বিস্মিতমাত্রই হইয়াছিল। মানুষ যখন কোন বিষয় বুঝিতে পারে না বা কার্য্য দেখিয়া তার

কারণ এবং উদ্দেশ্য ধরিতে পারে না, তখন সে বিস্ময়মাত্রই প্রকাশ করে। মতিবিবি যখন আপনার শরীর হইতে অলঙ্কার-রাশি মুক্ত করিয়া একে একে কপালকুণ্ডলাকে পরাইতে লাগিল, তখনও কপালকুণ্ডলা নির্ব্বাক্। বিস্ময়ের উপর বিস্ময় আসিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। ওইরূপভাবে দেখেই বা কেন ? ঐ মহামূল্য অলঙ্কার-রাশি পরাইয়াই বা দিতেছে কেন ? এ সমস্যার মীমাংসা খরবুদ্ধিশালিনী রমণীই পারে না ; কপাল-কুণ্ডলার ত কথাই নাই। তবে সাধারণ স্ত্রীলোকে অলঙ্কার পরে, তাহার মর্য্যাদা জানে ; কপালকুণ্ডলা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ ই অজ্ঞ, কাজেই অলঙ্কার পাইয়া তজ্জন্য তাহার কোন আনন্দের উদয় হইল না। বিধাতা তাহাকে বয়সই দিয়াছেন, বয়সের সঙ্গে অবশ্য অবয়বের পরিপূর্ণতাও দিয়াছেন, কিন্তু তদনুরূপ মানসিক ভাবনিচয়ের পরিপূর্ণতা প্রদান করেন নাই।

কপালকুণ্ডলা সংসার-অনভিজ্ঞা, স্বভাবে বালিকা, নচেৎ অকপট হৃদয়ে কৌটা-সমেত সকল গহনাগুলি ভিক্ষুকের হস্তে দিবে কেন ? বিহ্বল ভিক্ষুক এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া উর্দ্ধশ্বাসে গহনা লইয়া পলায়ন করিলে বালিকা ভাবিল, "ভিক্ষুক দৌড়াইল কেন" ?

এইবার সাংসারিক বুদ্ধি আর সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা। প্রকৃতির সেই মুগ্ধা কন্যা—আজ সংসারের ঘরণী গৃহিণী হইবে, যুবক নবকুমারের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি করিবে। নবকুমারের গৃহে আসিয়া কপালকুণ্ডলা সংসারিণী হইল। সেই এলায়িত কেশ-তরঙ্গমালা ননদ শ্যামাসুন্দরী কখন কখন জোর করিয়া খোঁপা

বাঁধিবার চেষ্টা করিত, সেই যোগিনীকে বধূ-সাজে সাজাইতে যত্ন পাইত। তথাপি মৃন্ময়ীর মুখখানি অবিন্যস্ত কেশভারে অৰ্দ্ধলুক্কায়িতই থাকিত। অন্তরে সে যোগিনী। তাহার প্রকৃতিতে রুচিতে, কার্য্যে ও ব্যবহারে একটি ঔদাসীন্য, অনাসক্তি ও অবহেলার ভাব সর্ব্বদা প্রকাশ পাইত। এজন্য ননদ শ্যামা, যোগিনী ও তপস্বিনী বলিয়া অনুযোগ করিতে ছাড়িত না। শ্যামা ভাবিত, পরশপাথরের স্পর্শে রঙ্গও যেমন স্বর্ণ হয়, পুরুষ-প্রণয়-স্পর্শে যোগিনীই বা সংসারিণী না হইবে কেন? বাস্তবিক অনেক দুর্দ্দান্ত বুনো-স্বভাবের মেয়েমানুষও এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াই গৃহিনী পদবাচ্য হয়, এ প্রকার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

মৃন্ময়ী অন্তরে এখনও সেই কপালকুণ্ডলাই আছে। স্বভাবের প্রভাব তাহার মনের উপর সেরূপ আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। তাই সে, স্বামীকে "ব্রাহ্মণকুমার" বলিয়া নির্দ্দেশিত করিত। শ্যামা দেখিল যে, মৃন্ময়ী নবকুমারের প্রাণঢালা ভালবাসায় আকৃষ্টা হয় নাই বা তাহাদের আদর যত্নে একটুও কৃতজ্ঞা পর্য্যন্ত হয় নাই, ইহা তাহার কথাটিতেই প্রকাশ পাইয়াছে —"বোধ করি, সমুদ্রের তীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে সুখ জন্মে।"

মৃন্ময়ীর অবস্থা আদৌ সুখের নহে। সংসারে তাহার সুখ বোধ হয় না। আবার সমুদ্র-তীরে বনে বনে বেড়াইতে পারিলেই সুখ হইবে—এ সম্বন্ধেও স্থির বিশ্বাস নাই। অথচ তাহাকে সেই সংসারেই থাকিতে হইবে, সমুদ্র-তীরে ফিরিয়া যাইবার উপায়ও আর নাই। আবার অবস্থাচক্রে তাহার উপর যাহা

আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা সে অবলম্বন করিতেও বাধ্য। "জগন্মাতা শিবের সহধর্ম্মিণী," "পতি ব্যতীত স্ত্রীলোকের অন্য গতি নাই" অধিকারীর এ কথাটি সে বিশ্বাস করিয়া আছে। সমুদ্রতীর হইতে যাত্রার সময়ে—"ত্রিপত্র মা ধারণ করিলেন না —অতএব কপালে কি আছে জানি না" এই ঘটনাটি তাহার চিত্তে এমনই একটি আশঙ্কা জাগাইয়া রাখিয়াছে, যাহা সে ক্ষণেকের জন্যও ভুলে না। ঐ ভয়টি না জাগরূক থাকিলে ভালই হইত। হয়ত মৃন্ময়ীর কিছু পরিবর্ত্তন দেখা যাইতে পারিত। বস্তুত মৃন্ময়ীকে যোগিনী ও তপস্বিনী রাখাই যখন বিধাতার অভিপ্রেত, তখন স্বরূপতঃ পরিবর্ত্তন না হওয়াটি অবশ্য তাহার স্বাভাবিকই হইয়াছে।

"মা ত্রিপত্র গ্রহণ করিলেন না" সংসারিণী শ্যামা ইহা শুনিয়াই শিহরিয়া উঠিল। কোন্ হিন্দু নারী না শিহরিয়া উঠে? কপালকুণ্ডলা ত ভবানীভক্তা—সে ত ইহা অশুভজনক ভাবিবেই। ত্রিপত্রচ্যুতিকালে তাই ভীতা হইয়াছিল এবং অধিকারীকে সে-ঘটনার কথা না বলিয়াও পারিয়াছিল না। শ্যামাকেও সে-ঘটনার কথাটি বলিয়া মৃন্ময়ী কেবল নীরব রহিল। কপালকুণ্ডলা যদি সংসারিণী হইত, শ্যামার মত পতিপ্রেমই নারী-জীবনের সার ভাবিত, সোণার পুত্তলি ছেলে কোলে করাই যদি সংসারের পরম সুখ মনে করিত, তাহা হইলে সেও শিহরিয়া উঠিত। পতিপ্রেমাকাঙ্ক্ষিনী সংসারিণী শ্যামার পার্শ্বেই এই উদাসীনার চিত্রটি বড় সুন্দর ফুটিয়াছে। একজন বলে "ফুলটি ফুটিলে ফুলেরও সুখ, লোকের দেখিয়াও সুখ"। অপর-

জন বলে, "ফুলেরই সুখ, লোকের কি?" একজন ভাবে, "প্রমোদকাননে মাধবীর মতন সহকারকে আলিঙ্গন করিয়া থাকাই সুখ"। অন্যজন ভাবে, "সমুদ্রতীরে বনে বনে বন্য হরিণীর মত ছুটিয়া বেড়াইলেই সুখ।" আসক্তির পার্শ্বে অনাসক্তি ফুটে ভাল। আকুলতার হাত ধরিয়া উদাসীনতা দাঁড়াইলে সুন্দরই দেখায়।

সমুদ্রতীরের সেই ভূষণহীনা আলুলায়িত-কুন্তলা কপাল-কুণ্ডলা আর সে "কপালকুণ্ডলা" নাই। স্পর্শমণির স্পর্শে যোগিনী বাহ্যতঃ গৃহিণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই কৃষ্ণোজ্জ্বল আগুল্ফ-লম্বিত কেশরাশি স্থূল বেণীরূপে পরিণত হইয়াছে। মুখমণ্ডল আর অবিন্যস্ত কেশভারে অর্দ্ধলুক্কায়িত থাকে না। কর্ণে কর্ণভূষণ, কণ্ঠে হিরণ্ময়ী মালা, পরিধানে অর্দ্ধচন্দ্র-দীপ্ত শুভ্র মেঘবৎ শুক্লাম্বর। মৃন্ময়ী বাহ্যতঃ গৃহিণী বটে, কিন্তু এখনও অর্দ্ধ-যোগিনী। সংসার এখনও তাহাকে বাঁধিতে পারে নাই। প্রণয় এখনও তাহাকে অন্তরে সংসারিণী করে নাই। স্পর্শ-মণির স্পর্শে এখনও তাহার ভিতরটি সুবর্ণ হইয়া উঠে নাই। তাই মধ্যে মধ্যে তার অদম্য বন্য স্বভাবটি সামান্য আঘাতেই মাথা খাড়া দিয়া উঠে।

"শ্যামার জন্য ঔষধ আনিব, দুঃখী-জনের জীবনের সুখ শান্তি আনয়ন করিব, তাহাতে লোকে অন্যায় বলিবে কেন? স্বামীই বা অসুখী হইবেন কেন?" ইহা ভাবিয়া কপালকুণ্ডলা যায় নাই। আর লোকে যদি অন্যায়ই বলে, স্বামী যদি অসুখীই হন, তাহাতেও কপালকুণ্ডলা পশ্চাৎপদ নহে। সেই দুর্দ্দমনীয়

আরণ্য স্বভাবটি, যাহা ক্রমে ক্রমে চাপা পড়িতেছিল, তাহা দ্বিগুণ বিক্রমে মাথা খাড়া দিয়া উঠিল। "ইহাতে তিনি অসুখী হন, আমি কি করিব? যদি জানিতাম যে, বিবাহ স্ত্রীলোকের দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।" বুঝা গেল, এ বন্যমৃগী বনেই রহিবে, সংসারে বাঁধা থাকিবে না। এ সিংহীকে পিঞ্জরে বাঁধিয়া রাখে, এমত পিঞ্জর আজিও প্রস্তুত হয় নাই। সংসারে আত্মসম্মান আহত, নারীহৃদয় অপমানিত হইলে মনস্বিনী নারীরা এইরূপই বলে। অভিমানবশে অভিমানিনী নারী ত এমন কথা বলিয়াই থাকে; ইহা সচরাচর আঘাতপ্রাপ্ত বা অভিমানোদ্বেলিত হৃদয়ের একটি ক্ষণিক উচ্ছ্বাস মাত্র। কিন্তু কপালকুণ্ডলার একথা, তাহার নিরুদ্ধ-প্রায় স্বভাবেরই অভিব্যক্তি, ক্ষণিক উচ্ছ্বাস মাত্র নহে।

তারপর, জ্যোৎস্নানিশিতে একাকিনী নির্ভীক নারী ঔষধ আনিতে গেল। ননদ শ্যামার কথাতে তাহার সেই দুর্দ্দমনীয় আরণ্য স্বভাবটি এমনই মাথা খাড়া করিয়াছে যে, পতির স্বমন স্নেহপূর্ণ কোমলস্বরেও সে অপ্রসন্না হইয়া উঠিল। "আমি তোমার সঙ্গে যাইব" এই কথাটিতেই ঈষদুত্তেজিতচিত্তা অপ্রসন্না হইয়াই কপালকুণ্ডলা গর্ব্বিত বচনে বলিল "আমি অবিশ্বাসিনী কি না, স্বচক্ষে দেখিয়া যাও।" ইহা প্রণয়িনী রমণীর অভিমানোত্থ বাণী নহে। তবে বাধাপ্রাপ্ত হইলে দুর্দ্দমনীয় চিত্তের যে একটি ক্রোধের ভাব দেখা যায়—সেই স্বাভাবিক ক্রোধের ভাবই এই কথাটির মধ্যে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

কপালকুণ্ডলা সেই নিবিড়তর বনের মধ্যে প্রবেশ করিল।

পথ ক্রমেই দুরধিগম; বৃক্ষের ঘনচ্ছায়ায় চন্দ্রালোকও একেবারে রুদ্ধ। শৈশব হইতে যদিও সে স্বভাবতই ভয়শূন্যা—তথাপি রমণী-স্বভাবসুলভ কৌতূহলবশে আলোকলক্ষ্যে অগ্রসর হইল। "নিশীথ রাত্রে ভগ্ন গৃহের মধ্যে দুইজনে কি কুপরামর্শ করিতেছে" এই ভাবিয়া তখন তাহার মনে একটি আগ্রহের ভাবও জাগিয়া উঠিল। সংসারের আবহাওয়ার মধ্যে আসার ফলে সঙ্গে সঙ্গে একটি শঙ্কার ভাবও যে, না ফুটিয়া উঠিয়াছে, এমনও বলা যায় না।

অকস্মাৎ ব্রাহ্মণবেশধারিণী পদ্মাবতী আসিয়া যেমন হস্ত ধরিল, অমনই স্বভাব-অভীরু কপালকুণ্ডলা তৎক্ষণাৎ সেই ধৃত হস্ত সবলে মুক্ত করিয়া লইল। পর-পুরুষে আসিয়া হস্ত ধরিলে সতী নারী তড়িৎ-পৃষ্টার মত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, কিংবা অগ্নিশিখার মত জ্বলিয়া উঠে, অথবা লজ্জাবতী লতার মত মরমে মরিয়া যায়। এ স্পর্শে কপালকুণ্ডলার কিন্তু সে ভাব হইল না। তবে পর-পুরুষের অনধিকার স্পর্শ যে অত্যন্ত অন্যায়, আর কুলবতী নারীর প্রতি এই স্পর্শ যে অমর্য্যাদাকর—এ ধারণা অবশ্য তাহার ছিল। ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্ব্বক এই হস্ত-গ্রহণে ভয় হওয়া দূরে থাক্, কপালকুণ্ডলার ইহাতে দৈহিক ও মানসিক বল যেন বর্দ্ধিতই হইল। তারপর রমণী-পরিচয় দিয়া ব্রাহ্মণবেশী তাহাকে বহির্দ্বারে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া গেল। "নিজের সম্বন্ধে কি কথা" এই ভাবিয়া কৌতূহলময়ী রমণী সেই গভীর রাত্রে একাকিনী আগ্রহে ব্রাহ্মণবেশীর প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

"কি জানি কি ঘটিবে" এই ভাবিয়া, এদিকে ব্রাহ্মণবেশীও অত্যধিক বিলম্ব করিতেছে আর ওদিকেও আকাশমণ্ডলও ঘন-

ঘটায় মসীময় হইয়া আসিতেছে দেখিয়া কপালকুণ্ডলা গৃহে ফিরিতে উদ্যত হইল। বনভাগের সামান্য আলোকও তখন নির্ব্বাপিত; কপালকুণ্ডলার যেন মনে হইতেছিল—কে তাহার পশ্চাতে অনুসরণ করিতেছে। ইহা যে ভীরু হৃদয়ের কল্পনামাত্র নহে, পরে তাহা জানা গেল।

আকাশ নীল মেঘমালায় ভীষণতর হইল, ভীষণ ঝটিকাবৃষ্টি মাথার উপর দিয়া বহিতে লাগিল। ঘন গম্ভীর মেঘধ্বনি, বজ্রের কড় কড় রব আর বিদ্যুতের ঘন চমকানির মধ্য দিয়া কপাল-কুণ্ডলা কোনও মতে বাটী আসিয়া পৌছিল। দ্বার বন্ধ করিতে গিয়া দেখে, অদূরে ভীষণদর্শন কাপালিক দণ্ডায়মান। ক্লান্তি, উৎকণ্ঠা এবং দুশ্চিন্তায় কপালকুণ্ডলা শয়ন করিল। তখন তাহার হৃদয়-সাগরে কত তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, কে গণনা করে? কপালকুণ্ডলার মানসপটে তখন ফুটিয়া উঠিল—কাপালিকের সেই জটাজুট-ভীষণ মুখশ্রী, সেই সদ্যক্ত নরমাংসে ভৈরবীর পূজা, আর নবকুমারের সেই সুকঠিন হস্তপদবন্ধন।

অতীতের যবনিকা সরিয়া গেল, তখন তাহার সম্মুখে বর্ত্তমানের বাস্তব দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল। নবকুমারকে তিরস্কার করিয়া রাত্রে একাকিনী অরণ্যে গমন, ব্রাহ্মণবেশী-কর্ত্তৃক সহসা হস্তধারণ, ঝড় বৃষ্টির মধ্য দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন আর সর্ব্বশেষে গৃহদ্বারে কাপালিকের ছায়া-দর্শন—এই সমস্ত চিন্তা আসিয়া তখন তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

কপালকুণ্ডলা স্বপ্ন দেখিল—সংসারসিন্ধুতে ভাসমান তাহার জীবন-নৌকাখানিকে ডুবাইয়া দিবার জন্য কাপালিক অগ্রসর।

ব্রাহ্মণবেশী আসিয়া উদ্ধার করতঃ জিজ্ঞাসা করিল, "রাখিব, না ডুবাইয়া দিব?" বলিয়াই নৌকাখানিকে ভাসাইয়া দিল। সেই নৌকাই শেষে শব্দময়ী হইয়া "আমি এ ভার আর সহিতে পারি না" বলিয়া নিজেই পাতালে প্রবেশ করিল। কপালকুণ্ডলা নিজেরই ভবিষ্যৎ স্বপ্নে দেখিল। নিষ্পাপ অকলুষ সত্ত্বময় চিত্তে ভবিষ্যতের ছায়াপাত সহজেই ঘটে। নিয়তিও তাহার এই। প্রকৃতির নিষ্পাপ শিশুটিকে কে মারিবে? প্রকৃতি আপনিই তাহাকে ক্রোড়ে স্থান দিবে। শুনিয়াছি, একদিন ধরিত্রী দেবী জনকনন্দিনীকে এইরূপই বক্ষে তুলিয়া লইয়াছিলেন। কাপালিকের সাধ্য কি, ডুবায়? ব্রাহ্মণবেশী পদ্মাবতীর কি শক্তি যে, তাহাকে রক্ষা করে? আর নবকুমারেরই বা সে সাধ্য কোথায় যে, বলি দেয়? সাগরগর্ভেই তাহার আবির্ভাব, সাগরগর্ভেই তাহার বিলয়।

ব্রাহ্মণবেশী পদ্মাবতীর পত্র পাইয়া কপালকুণ্ডলা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করাই মত করিল। মহাকবি বলিয়া দিয়াছেন—"কপালকুণ্ডলা কৌতূহলপরবশ রমণীর ন্যায় সিদ্ধান্ত করিল, নৈশ-ভ্রমণবিলাসিনী সন্ন্যাসিনী-পালিতার ন্যায় সিদ্ধান্ত করিল, জ্বলন্ত বহ্নিশিখায় পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিল।" গভীর রাত্রে বনাভিমুখে কপালকুণ্ডলার প্রস্থান আর সঙ্গে সঙ্গে গৃহদীপও অমনই নির্ব্বাপিত। সংসারসুখের আজ সমাপ্তি; জীবনদীপেরও আজ নির্ব্বাণ। গৃহের প্রদীপই বা জ্বলিবে কেন? পতির প্রাণে এত বড় আঘাত দেওয়ার ফলেই কপালকুণ্ডলার এই মৃত্যুরূপ-পরিণাম—ইহা প্রকৃতির নিষ্পাপ শিশুটির পক্ষে খাটে না।

ব্রাহ্মণবেশী আপনাকে নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী পদ্মাবতীরূপে পরিচয় দিল এবং কপালকুণ্ডলার নিকট যাচিকার ভাবে পতি-ভিক্ষা চাহিল। তারপর "প্রাণ দাও, স্বামী ত্যাগ কর" বলিয়া অট্টালিকা, অর্থ ও দাসদাসীর প্রলোভনও দেখাইল। মূর্খ পদ্মাবতী! পরের মঙ্গলের জন্য যে স্বামীর বারণ অগ্রাহ্য করিয়া, একাকিনী রাত্রিকালে অরণ্যে ঔষধ আনিতে যায়, একমাত্র পরের মঙ্গলের জন্য আশ্রয়স্থল স্বামীকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারে, প্রলোভন তাহার নিকট বৃথা।

কপালকুণ্ডলা অন্তঃকরণমধ্যে দৃষ্টি করিল—তথায় সংসার-সুখের কোন প্রলোভন নাই, নবকুমারকেও সেস্থানে দেখিতে পাইল না; তবে কেন সে অপরের সুখের পথ বন্ধ করিয়া থাকিবে। পদ্মাবতীর কাছে প্রতিশ্রুত হইল—"আমি তোমার সুখের পথ রোধ করিব না," "তোমার মানস সিদ্ধ হউক—কালি প্রাতেই বিঘ্নকারিণীর কোন সংবাদ পাইবে না। আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব।" ইহাও দয়াময়ীর দয়া, পরার্থপরার আত্মত্যাগ!

এই সরলা নিষ্পাপ বালা যদি পদ্মাবতীর নিকট এই সত্য না করিত, তবে কাহারও সাধ্য ছিল না যে, বলপূর্ব্বক পতি পরিত্যাগে বা সংসার-পরিহারে তাহাকে স্বীকৃত করিতে পারিত। প্রকৃতির নিষ্পাপ শিশুর এমন কর্ম্মফল জন্মে নাই, যাহা তাহাকে অবশ করিয়া ফলাফলের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে।

কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে পতিপ্রেমের মুকুল ফুটে নাই, সংসার-সুখের সাধ জাগে নাই। তাহার উপর অতীত এবং বর্ত্তমানের

ঘটনাপুঞ্জ তাহাকে এমন অসম্ভব রকমে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলে যে, তাহাতে সে পদ্মাবতীর নিকটে সহজেই পতিত্যাগ করিতে স্বীকৃতা হয়। নিষ্পাপ পবিত্র প্রাণের আকাঙ্ক্ষা কখনও অপূর্ণ থাকে না, বা স্বতঃপবিত্র আত্মার বাণীও কখন মিথ্যা হয় না। "পদ্মাবতীর সুখের পথে বিঘ্নস্বরূপ থাকিব না" এই প্রতিশ্রুত বাণীটি সফল হওয়া চাই, অথচ সংসারে থাকাও তাহার আর চলে না—কাজেই অবস্থাটি ত্রিশঙ্কুর মত হইয়া আসিয়াছে। বনবাসে সেই বনে বনে বেড়ান, অর্দ্ধমৃন্ময়ী কপালকুণ্ডলার পক্ষে অধুনা অসম্ভবই দাঁড়াইয়াছে।

সে যে এখন, মনেঁ না হউক—শিক্ষা এবং সংসর্গের গুণে কতকটা গৃহস্থ-ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সে যুবতী কুলকামিনী, এখানে ওখানে বেড়ান তাহার ভাল দেখায় না—ইহা সে বুঝিতে শিখিয়াছে। বাহ্যদৃষ্টিতে সে আর এখন বনচারিণী বালিকামাত্র নহে। মনে প্রাণে সে এখন আর আপনাকে তাহা ভাবিতেও পারে না। এক্ষণে কপালকুণ্ডলার বাঁচিয়া থাকাই অসম্ভব, সমুদ্রে ভাসিয়া যাওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই। প্রকৃতির দুহিতা সংসারের তাপে জ্বলিয়া পুড়িয়া, জলময়ী প্রকৃতির স্নিগ্ধ বক্ষেই স্থান লাভ করিল। সমুদ্রবসনা প্রকৃতি নিজের কন্যাকে স্বীয় অঙ্গে বিলীন করিয়া লইল। কপালকুণ্ডলা নিজে রহস্যময়ী—এই কারণে তাহার জন্ম রহস্যময়, চরিত্র রহস্যময় এবং তাহার সংসারিণী হওয়াও রহস্যময় ; এমন কি তাহার সহসা অন্তর্দ্ধানপর্য্যন্তও রহস্যময়।

প্রকৃতির নবশিশুটির কোথা হইতে আবির্ভাব, কোথায় পরিণতি—এই তত্ত্বটি অজ্ঞেয় আবরণে আবৃত করিয়া রাখাই মহাকবি

ভাল বুঝিয়াছিলেন। যে আশ্চর্য্যময়ী, তাহার সমস্তই অপূর্ব্ব ও আশ্চর্য্যময় করাই চরিত রচনার কৌশল। এই নিষ্পাপ কোরকটিকে সংসারের উদ্যানে সম্পূর্ণরূপে ফুটাইয়া কাজ নাই। বিলাসী যুবকের বিলাস-সামগ্রী হইবার জন্য যে আদৌ সৃষ্টা নহে—তাহাকে অরণ্যে ফুটাইয়াও ফল নাই। সে কোরকটি ফুটিলেই ত মধু জন্মিবে, সৌরভ ছুটিবে, ভ্রমরও আসিয়া জ্বালাতন করিবে, বাতাসও কোন্ না আসিয়া অকস্মাৎ ভূমিসাৎ করিয়া দিবে, অথবা সেই বিকসিত কোরকটি আপনা আপনিই শুষ্ক হইয়া ঝড়িয়া পড়িবে। ইহাও কি অভিপ্রেত? কাজেই বলিতে হইবে, এই পরিণতি কপালকুণ্ডলার যোগ্যই হইয়াছে।

বিমলা।

কলঙ্কিতা হইয়াও যে নিষ্কলঙ্কা, সেই বিমলা। বি শব্দটির "বিশেষরূপ" এবং "বিগত" দুই অর্থই হয়। মল অর্থে কলঙ্ক। অভিরাম স্বামীর ঔরসে, শূদ্রী বিধবার গর্ভে বিমলার জন্ম। বিমলা জারজা কন্যা। যে জারজা, সে কলঙ্কিতা বৈ আর কি? আবার আপনা হইতেই সে বীরেন্দ্রসিংহের অনুরাগিনী। বিবাহ করিতে যে চাহে না, তথাপি তাহারই দাসীত্বে সে আকাঙ্ক্ষিনী। এমন কি, গোপনে বিবাহিতা হইয়া জনসমাজে কলঙ্কের দুর্ভর পশরা মাথায় লইয়া হাসিমুখে রাজার পরিচারিণী-রূপে অনুগামিনী। বিমলা—বি-মলা। স্বভাবে সে কলঙ্কশূন্যা, পতিব্রতা সাধ্বী রমণী। হাস্যময়ী, সুখ-চঞ্চলা, পতিহত্যার প্রতিশোধ লইবামাত্র একেবারে উন্মাদগ্রস্তা। এ বিমলাকে সতী না বলিয়া কি বলিব? এমন যে একনিষ্ঠা, এমন যে পতিপ্রাণা, পতির সুখে দুঃখে এমন যে সঙ্গিনী—তাহাকে সতী বলিব না ত, তবে কাহাকে সতী বলিব?

বিমলা নামেও দ্ব্যর্থক, স্বভাবেও দ্ব্যর্থক। একরূপে সে অসতী-মত আচরণে অভ্যস্তা, অন্যরূপে সে সতীসম মর্য্যাদায় গৌরবান্বিতা। কখন রহস্যপ্রিয়া চপলা নটী, কখন বা গম্ভীরা স্থিরবুদ্ধি গৃহিণী। কখন কূলঙ্কষা তটিনী, কখন বা পূতসলিলা মন্দাকিনী।

বিমলা পদ্মিনী, শঙ্খিনী, চিত্রানী ও হস্তিনীর সমবায়ে নির্ম্মিতা। পদ্মিনীর মত মুগ্ধা, শঙ্খিনীর মত রঙ্গরসিকা, চিত্রানীর মত নৃত্যগীতপ্রিয়া আর হস্তিনীর মত কামোন্মাদিনী। বিমলার তুলনা বিমলাই। এ যেন বেদান্তের মায়া। কভু সতী, কভু অসতী, কভু বা সদসতী। কখন মায়াবিনী, কখন অপরূপ রূপময়ী, কখন বা অঘটনঘটনপটীয়সী। কোথাও দেবী, কোথাও মানবী, কোথাও বা দানবীসাজে সজ্জিতা। অপূর্ব্বা, অনির্ব্বচনীয়া ও অনন্যসাধারণী। প্রেমিকাসম অশ্রুমুখী, আর রাক্ষসীসম নরঘাতিনী—এ মূর্ত্তির তুলনা নাই।

বিমলাকে যেভাবে গজপতির সহিত রসালাপ এবং রহিম সেখের সঙ্গে প্রেমখেলা করিতে দেখি—তাহা সকল নারী পারে না। যাহারা পারে, বিমলা তজ্জাতীয়া নহে। বিমলা সতীর কন্যা হইলে হয়ত পারিত না। অসতী হইয়া করিলে তাহার এ বিশেষত্বটুকুই থাকিত না। এ সৌন্দর্য্য, এ মাধুর্য্যও আদৌ দেখা যাইত না।

আদর্শের দিক্ দিয়া দেখিলে বিমলার এ কার্য্য প্রশংসনীয় নহে, বরং নিন্দনীয়। তবে মনের দিক্ দিয়া বিচার করিলে এ কার্য্য আর অন্যায় প্রতীত হয় না। মন লইয়াই ত সমস্ত। পাপ ও পুণ্য, সকলই মনে। বৈদান্তিকেরা বলেন—"মানস সংস্কারের উপরই সুখদুঃখ ও পাপপুণ্য প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বও মানসসংস্কারজনিত ভ্রান্তি মাত্র।" মন যদি ঠিক পবিত্র থাকে, তবে আপাতদৃষ্টিতে অন্যায়বৎ প্রতীত কার্য্য অন্যায় হয় না। বিমলা যখন যে খেলাই খেলিয়াছে, অসতীর মত যে আচরণই

করিয়াছে—সমস্তই তাহার অভিনয় মাত্র। সে খেলায়, সে আচরণে তাহার মনের যোগ ছিল না। সকল অবস্থাতেই তাহার মন নির্ম্মল এবং বিশুদ্ধই ছিল।

বিমলা পঞ্চত্রিংশৎবর্ষীয়া। এই বয়সে অনেকেই প্রৌঢ়াবৎ হইয়া পড়ে, বিমলা কিন্তু এখনও পূর্ণ যুবতী। তাহার তাম্বুলা-রক্ত ওষ্ঠাধর, কজ্জলনিবিড় আকর্ণ লোচন, আর সেই লোচনের চকিত কটাক্ষ দেখিলে—কে বলিবে, বিমলা চতুর্ব্বিংশতিবয়স্কার অধিক? চাঁপাফুলের মত তাহার মসৃণ ত্বক্, চমরীপুচ্ছের মত তাহার নিবিড় কেশপাশ, রসে ঢলঢল তাহার মুখকান্তি, কাহার না মনোমোহন? নিজের যৌবনশোভায় সে নিজেই হাসে, বীণানিন্দিত কণ্ঠে গুণ গুণ সঙ্গীত গায়, গোলাপবাসিত তাম্বুলে অধর রঞ্জিত করে। বিমলা যখন ভ্রমণে বাহির হয়, তখন সে রত্নোজ্জল কাঁচলি, জড়োয়া অলঙ্কার ও মুক্তাশোভিত পাদুকা পরিয়াই যায়। রূপের দীপ্তিতে পথ আলো করিয়া যখন সে ঠমকে ঠমকে চলিয়া যায়, তখন অনেক পতঙ্গ সে আলোয় পুড়িবার আকাঙ্ক্ষা করে। কবি বলিয়াছেন—"বিমলা প্রদীপের আলো। তাহাতে গৃহকার্য্য চলে কিন্তু স্পর্শ করিলেই পুড়িয়া মরিতে হয়।"

আমরা বলি, বিমলা জ্বলন্ত বহ্নিশিখা। সে শিখায় "রহিম সেখ" পুড়িয়া মরিল, "গজপতি" অর্দ্ধদগ্ধ হইল, "নবাব কতলুখাঁ" জন্মের মত ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেল।

বিমলা বিলাসিনী, দর্পিতা, সুখলালসা-পূর্ণা ও প্রগল্‌ভযৌবনা নারী। তাহার সৌন্দর্য্য অপরাহ্ণের স্থলপদ্মের ন্যায়। নির্ব্বাস

মুদ্রিতোন্মুখ-পল্লববিশিষ্ট অথচ সুশোভিত। অধিক বিকাসিত, অধিক প্রভাবিশিষ্ট।

বিমলা মাতৃহারা হইয়া শৈশবে পিতার নিকট পালিতা। প্রথম যৌবনে স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আইসে নাই বলিয়া সে বড় লজ্জাশীলা হইতে পায় নাই, বরং কতকটা পৌরুষভাবাপন্নাই হইয়াছে। একাকিনী, সঙ্গিনীশূন্যা বিমলা তাই কতকটা স্বাধীনভাবাপন্না ও দৃঢ়প্রকৃতি দাঁড়াইয়াছে। একেই প্রকৃতিতে সে লজ্জাশূন্যা, তদুপরি সুশিক্ষা এবং সৎসংসর্গ সে প্রাপ্ত হয় নাই, কাজেই বয়-আধিক্যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার গুণে, সেই লজ্জাশূন্যতা তাহার আরও বৃদ্ধিই পাইয়াছে। কার্য্যক্ষেত্রে সে বীর-নারীর মত দৃঢ়চিত্তা, অভিনেত্রীর মত ইচ্ছাময়ী এবং বেশ্যার মত নির্লজ্জা।

অলঙ্কারশাস্ত্রের মতানুসারে বিমলা "প্রগল্‌ভজাতীয়া" নায়িকা-শ্রেণীর অন্তর্গত। তিলোত্তমা মুগ্ধা, আয়েষা মধ্যা, আর বিমলা প্রগল্‌ভা। প্রগল্‌ভার লক্ষণ—

> স্মরান্ধা গাঢ়তারুণ্যা সমস্তরতকোবিদা।
> ভাবোন্নতা দরব্রীড়া প্রগল্‌ভাক্রান্তনায়কা॥

যৌবনমদমত্তা, কামোন্মাদিনী, বিলাসিনী এবং সুখ-লালসাপূর্ণা নারীই "স্মরান্ধা।" বিমলা রূপে ঢল ঢল, রসে টল মল, ভাবে গদ গদ, সুখলালসায় আত্মহারা-রূপেই চিত্রিতা। "গাঢ়তারুণ্যা" —প্রগাঢ়যৌবনা। অধিক বিকশিত, অধিক প্রভাবিশিষ্টা বলিয়াই বিমলা "গাঢ়তারুণ্যা"। "সমস্তরতকোবিদা"—সমগ্ররত-নিপুণা ; মধুর কলা ও ললিত লীলা প্রভৃতিতে পারদর্শিনী।

"ভাবোন্নতা"—অনুভাবে উন্নতা। হাব ভাব বিলাস বিভ্রম ভ্রূভঙ্গী কটাক্ষ, অনুভাবেরই মধ্যে। "দরব্রীড়া"—ঈষৎলজ্জাযুক্তা। অসতী ব্যভিচারিণী নহে যে, বিমলাকে একেবারে নির্লজ্জা বলা যাইবে। "আক্রান্তনায়িকা" (আক্রান্তো নায়কো যয়া) তাহা বীরেন্দ্র সিংহেই প্রকাশ; রহিমে, গজপতিতে ও নবাব কতলুখাঁতে পরিস্ফুট।

বলিয়াছি—মাতৃহারা বিমলা পিতার নিকটেই থাকিত। শিষ্যরূপে বীরেন্দ্র প্রত্যহ তথায় যাওয়া আসা করিত। পরস্পর-দর্শনে বীরেন্দ্র উন্মত্ত, বিমলাও অনুরাগিনী হইয়া পড়িল। গোপনে উভয়ের নয়ন-কোণে কটাক্ষ খেলিয়া যাইত, সাক্ষাৎমাত্র দুজনের অধরে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিত। উভয়ের ভাব লক্ষ্য করিয়া অভিরাম স্বামী (বিমলার পিতা) বীরেন্দ্রের নিকট একদিন বিমলার বিবাহ প্রস্তাব করিলেন। শূদ্রী-কন্যা বলিয়া বীরেন্দ্র বিবাহ করিতে চাহিল না। তখন বীরেন্দ্রের আগমনে কন্যার অনিষ্ট সম্ভাবনা বুঝিয়া ভবিষ্যদ্দর্শী পিতা তাহাকে আসিতে বারণ করিয়া দিলেন।

বিমলা সমস্ত ব্যাপার শুনিল, তথাপি সে বীরেন্দ্রের আশা ত্যাগ করিতে পারিল না। আকর্ষণ এত তীব্র, বিমলা কোনমতে আপনার মনকে ফিরাইতে সমর্থ হইল না। মেঘ-জলাশায় চাতকীর মত সে বীরেন্দ্রের আগমনপথ চাহিয়া থাকিত। সংসারের কাজকর্ম্ম তার আর ভাল লাগেনা। অভাগী ভালবাসার নূতন মোহে আত্মহারা হইয়া রহিল। এতই সে স্মরান্ধা, এতই সে ভাবাভিভূতা, এতই সে লজ্জাহীনা প্রগল্ভা—

বিবাহ যে করিবে না, তাহাকে তবু সে চাহে; তাহাকে না দেখিলে সে বাঁচে না। ইহাকেই বলে, প্রকৃত প্রেমোন্মাদিনী।

বিবাহে অনিচ্ছুক বীরেন্দ্রের কামানলে পিতা ত আর জ্ঞানহীনা কন্যাকে আহুতি দিতে পারেন না, কাজেই তাহাকে বীরেন্দ্রের চক্ষুর অন্তরালে রাখিবার জন্য মানসিংহের অন্তঃপুরে উর্ম্মিলা রাণীর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া আসিলেন। সেই কড়া পাহারার মধ্যেও বীরেন্দ্র "আশমানী" নামক দাসীর সাহায্যে বিমলার সহিত পত্র লেখালেখি চালাইতে লাগিল।

একদিন বীরেন্দ্রসিংহ আশমানীকে ধরিয়া বারিবাহক দাসরূপে মানসিংহের অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিভ। বুদ্ধিমতী বিমলা অবশ্য এ পরামর্শ দেয় নাই। কারণ ইহাতে কত বড় বিপৎ তাহা সে বুঝিত। দুইখানি মেঘই বিদ্যুতে ভরা। একদিন না, একদিন অবশ্য মিলন হইতই। বীরেন্দ্রের কিন্তু ত্বরা সহিল না। বিমলা ভিতরে যতই উন্মত্তা হউক, রমণীসুলভ স্বভাবরীতি সহজে পরিহার করিয়া সে কখনই বীরেন্দ্রের নিকট যাইত না, ইহা নিশ্চিত। প্রেমে সে উন্মাদিনী বটে কিন্তু বীরেন্দ্রের মত উন্মত্ত বা আত্মহারা নহে।

ভাগ্যগুণে আজ চির আকাঙ্ক্ষিত প্রাণাধিক উপস্থিত। বিমলা সকল কথা ভুলিয়া প্রিয়তমের কণ্ঠলগ্না হইয়া কাঁদিতে বসিল। যে বীরেন্দ্র তাহাকে বিবাহ করিতে চাহে না, অথচ আকাঙ্ক্ষা করে, সমস্ত বুঝিয়াও সেই বীরেন্দ্রেই তথাপি সে আত্মহারা, এমন কি আত্মদানে ব্যাকুলা। সেইদিনই বিমলা আপনাকে প্রিয়তমের চরণে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিত। মানসিংহের অন্তঃপুরে—সে ভয় তখন তাহার থাকিয়াও নাই।

আচম্বিতে তাহাদের মিলনে বাধা পড়িল। স্বয়ং মানসিংহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য, তৎক্ষণেই বীরেন্দ্রসিংহ ধরা পড়িয়া কারাগারে প্রবেশ লাভ করিল। বিমলা কি করিল? সে তখন সমস্ত দোষ নিজের স্কন্ধে লইয়া রাণী উর্ম্মিলা দেবীর চরণে লুণ্ঠিত হইয়া ক্ষমা চাহিল। ব্যবস্থা হইল, বীরেন্দ্র যদি বিমলাকে বিবাহ করে, তবেই তাহার মুক্তি। বীরেন্দ্রও সহজে বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহে। অবশেষে কারাগারে কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া কহিল—

"বিমলা যদি আমার গৃহে পরিচারিকা হইয়া থাকিতে পারে, বিবাহের কথা আমার জীবিতকালে কখন উত্থাপন না করে, আমার ধর্ম্মপত্নী বলিয়া পরিচয় না দেয়, তবে শূদ্রীকে বিবাহ করিব, নচেৎ নহে।"

বিমলা বিপুল পুলকসহকারে তাহাতেই স্বীকৃতা হইল। বীরেন্দ্রকে ত সে পাইল, কারাগার হইতে তাহার প্রিয়তমের ত উদ্ধার হইল। বিমলার তাহাই লাভ। দাসীবেশে ভর্ত্তৃগৃহে প্রবেশ করিয়া বিমলা তখন লোক-চক্ষুতে রক্ষিতাবৎ বাস করিতে লাগিল। এ ভালবাসার এক মূর্ত্তি। এ আত্মত্যাগের এক পৃথক্ আকার। ক্ষুদ্রপ্রাণা হীন নারীর মত সে বাধ্য হইয়া কলঙ্কের ভার মাথায় চাপিয়া লয় নাই। এ স্বেচ্ছায় প্রেমাস্পদে আত্মসমর্পণ। ইহাই বিমলার মহত্ত্ব।

বিমলার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অসাধারণ। শৈশবে চোরের হস্ত হইতে সে এক পাঠানবালককে (উত্তরকালে ইহারই নাম ওস্‌মান্) রক্ষা করে। সেই উপকারের প্রত্যুপকারস্বরূপ মুক্তি-অঙ্গুরী

লাভ করিয়া তাহার দ্বারাই তিলোত্তমার উদ্ধার সাধন করিয়া লয়। মানসিংহের অন্তঃপুরে উর্ম্মিলা রাণীর সাহচর্য্যে থাকিয়া তাহার সেই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আরও ভালরূপেই ফুটিয়া উঠে। সেইস্থানেই সে লেখাপড়ায় সুশিক্ষিতা ও নৃত্যগীতে পারদর্শিনী হয়।

শৈলেশ্বর-মন্দিরে জগৎসিংহের সমক্ষে বিমলার সহিত আমাদের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে। তাহার বাক্‌পটুতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় সেইস্থানেই পাইয়া মুগ্ধ হইয়া থাকি। দ্বিতীয়বার শৈলেশ্বর মন্দিরে যাইবার পথে অশ্বপদচিহ্ন দেখিয়া "অশ্বারোহী সৈন্য গড়মন্দারণের পথে গিয়াছে"—বিমলা এই সিদ্ধান্ত করে। ইহাতে তাহার দূরদৃষ্টির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সহিত তাহার সাহস ও নির্ভীকতা বস্তুতঃ বড়ই বিস্ময়কর। পঞ্চমীব্রতের নাম করিয়া গুপ্ত পথ দিয়া বর্ষা আনিয়া দেওয়ায়, উদ্যতাস্ত্র যবন সেনাপতির চক্ষুর উপর চাবীগুচ্ছ উদ্যানে ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করায়, এই সাহস ও নির্ভীকতা বিশেষরূপেই পরিস্ফুট। বিমলা যেরূপ মাদকতাপূর্ণ রসালাপে, প্রাণঘাতী কটাক্ষসন্ধানে প্রহরীকে মুগ্ধ করিয়া পলায়ন করে, একবার নহে, দুইবার—তাহা কয় জন নারী পারে?

বিমলা অত্যাশ্চর্য্যরকমের অভিনেত্রী। সে যখন অভিনয় করে, তখন তাহা অভিনয় বলিয়া করে না। বোধ হয় যেন স্বাভাবিক ভাবেই করিতেছে। ওড়না দিয়া কেমন রহিমসেখকে বাতাস করিল, কোমল করপল্লবে কেমন তাহার কর দুটী বেড়িয়া ধরিল, কণ্ঠের হার তাহার কণ্ঠে কেমন আদর করিয়া পরাইয়া দিল। মুগ্ধ—মূর্খ রহিম সশরীরে স্বর্গে গেল।

বস্তুতঃ মনের উপর যাহার অসীম প্রভুত্ব ও গভীর বিশ্বাস আছে, সে-ই এ অভিনয় করিতে পারে। যাহার তাহা নাই, তাহার এ অভিনয় সাজে না। যে পারেনা, তাহার নিকট ইহা ভীতিপ্রদও বটে, পাপবৎ উত্তেজকও বটে। যে পারে, সে ইহা খেলার মত সহজই ভাবে এবং আমোদও পায়।

বিমলার প্রাণ উদার ও স্নেহময়। তিলোত্তমার প্রতি যখনই তাহার অবিশ্বাস জন্মিয়াছে, তখনই সে জগৎসিংহকে বলিতে কুণ্ঠিতা হয় নাই যে, তিলোত্তমার স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেল। ইহা তাহার চিত্তের উদারতা। ওস্‌মানের নিকট মুক্তি-অঙ্গুরী লাভ করিয়াই, দুঃখিনী বুঝিবামাত্র তিলোত্তমাকে তাহার বহির্গমনের উপায় করিয়া দিয়াছে। ইহা তাহার স্নেহের নিদর্শন।

বিমলার প্রাণ কুসুমের মত কোমল, আবার সময়-বিশেষে বজ্রবৎ কঠোর। জগৎসিংহকে বর্ষা আনিয়া দিয়া, আপনাকে নরহত্যার নিমিত্তভাগিনী মনে করিয়া যাহার মুখে শুনিলাম "আমি মহাপাতকিনী, আজ যে কর্ম্ম করিলাম, বহুকালেও তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইবেনা"—সেই বিমলাই আবার অবলীলাক্রমে কতলুখাঁর বক্ষে আমূল ছুরিকা বসাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে নাই!

চক্ষুর উপর পতিহত্যার নৃশংস দৃশ্য দেখিয়া তাহার হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি চাপা পড়িয়া গিয়াছে। প্রিয়তমের রক্ত-স্রোতোধারায় স্নান করিয়াই যেন সে প্রস্তর-কঠিনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে কি ভীষণ দৃশ্য! সহস্র জনতার সম্মুখে বীরেন্দ্র

সিংহের ছিন্নশির রুধিরাক্ত হইয়া ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। সে দৃশ্যে মস্তকের একটি কেশ বাতাসে দুলিল না, চক্ষু হইতে একবিন্দু অশ্রু ঝরিল না। শোকভার-স্তম্ভিতা হইয়া অভাগী শুধু নিষ্পলকনেত্রে স্বামীর ছিন্নশির প্রতি চাহিয়া রহিল।

পতির অন্তিমকালের অনুরোধ—"প্রতিশোধ লইও।" সতী পতির আজ্ঞা পালনের জন্য শোকমাত্র-দ্বিতীয়া হইয়া বাঁচিয়া রহিল। বিষাদম্লান মুখে বলপূর্ব্বক হাসি ফুটাইল। নৃত্যগীতে নবাবের মনোরঞ্জন করত প্রতিশোধের অবসর প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

জন্মোৎসবের আনন্দদিনে বিমলা মনোমোহিনী সাজিয়া কেমন সোহাগে নবাবকে পাত্রের উপর পাত্র মদিরা ঢালিয়া দিতে লাগিল। ঘুরিয়া ঘুরিয়া নবাবকে বেড়িয়া কেমন হাব-ভাবের সহিত নৃত্য করিতে লাগিল। অবসর বুঝিয়া মদিরাপান-বিহ্বল নবাবের বক্ষে তখন আমূল ছুরিকা বসাইয়া দিল। "আমি পিশাচী নহি, সয়তানী নহি, বীরেন্দ্র সিংহের বিধবা মহিষী" এইরূপে হত্যার উদ্দেশ্য ও কারণটি ব্যক্ত করিল। পরলোক-গত পতির আজ্ঞা পালন করিয়া সতী পত্নী-ঋণ শোধ দিল। তৃষার্ত্ত পতি এই রক্ততর্পণে তৃপ্ত হইলেন, ইহা ভাবিয়া সতী তৃপ্তা হইল।

নবাবকে এই যে হত্যা—ইহা প্রকৃত হত্যা নহে, দণ্ড। পতির নৃশংস হত্যার দণ্ড দিবার কেহ নাই দেখিয়া পত্নী নিজ হস্তে এই দণ্ডভার গ্রহণ করিল। পতির আজ্ঞা না থাকিলে বিমলা হয়ত ভগবানের উপর ভার দিয়া কেবল রোদনে বক্ষ

ভাসাইত। দণ্ড দিতেছি, পতির আজ্ঞা পালন করিয়া তাঁহাকে তৃপ্ত করিতেছি, এই বিশ্বাস ছিল বলিয়া দণ্ডবিধাত্রী পত্নী মুহ্যমানা হইল না, বরং সেই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে, স্থির মস্তিষ্কে বুদ্ধির কৌশল করিয়া কেমন পলায়ন করিল।

পতি-আজ্ঞা পালিত হইয়াছে, হত্যাকারীও চরমদণ্ড পাইয়াছে, বিমলার আর করিবার কিছুই নাই। কাজেই তখন রুদ্ধ পতিশোক আসিয়া বিমলাকে পাইয়া বসিল। বিমলা আর সে বিমলা নাই। সেই চঞ্চলা হাস্যময়ী নারী, গম্ভীরা বিষাদিনী হইয়া যেন এক নূতন প্রাণিতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। একে চক্ষুর উপর পতিহত্যা, তাহাতে আবার স্বহস্তে নরহত্যা (যদিও দণ্ড) ; অবলা নারী সহ্য করিতে না পারিয়া উন্মাদিনী হইয়া গেল।

কখন উন্মাদিনী, কখন প্রকৃতিস্থা, এইরূপে বিমলা অবশিষ্ট জীবন কাটাইতে লাগিল। সে যে অধিক দিন বাঁচিয়া থাকে নাই, তাহা অমর কবি বলিয়া না দিলেও আমরা জানিয়াছি।

গোবিন্দলাল।

একজাতীয় প্রকৃতি আছে—যাহারা অশ্বের মত তালে তালে চলে, পার্শ্বে বা পশ্চাতে না চাহিয়া ছুটিতে আরম্ভ করে। ভাবের স্রোতে ভাসিয়া যায়, কোথায় গিয়া উঠিবে, সে বিষয়ে লক্ষ্য করে না। খ-ধূপের মত দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, আবার অল্পক্ষণ পরেই দগ্ধমুখ, নতশিরে ভূমিতে পড়িয়া লুটাপটী খায়। ভালর দিকে আপনাভোলা প্রেমিক, মন্দের দিকে লম্পট, হত্যাকারী। শুভাদৃষ্ট থাকিলে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হয়, দুরদৃষ্ট থাকিলে হত্যা করিয়া অজ্ঞাতবাস করে। ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীরে সুস্থে কার্য্য করা ইহাদের ঘটে না। ইহারা প্রচণ্ড অভিমানী; দুর্ব্বল অথচ নির্ম্মম। দেবতা হইতেও ইহারা, দানব হইতেও ইহারা। স্বভাবে শিশুর মত সরল, নারীর মত ভাবপ্রবণ, যুবার মত হঠকারী। গোবিন্দলাল এই-জাতীয় চরিত্রের।

"গোবিন্দলাল" এই নামকরণটির মধ্যে রহস্য আছে। বর্ণ গৌর—লাল, অনুরাগের রাগে মনপ্রাণ লাল, ভোগের অগ্নি-শিখায়, হত্যার রক্তপাতে লাল। "লাল" গ্রাম্য শব্দ। বিকার হইতে বৈরাগ্যের উদ্ভব বলিয়া তাহাও লাল। পরিশেষে সংসার ত্যাগ করিয়া গোবিন্দে সমর্পিতপ্রাণ—কাজেই গোবিন্দে লাল। প্রেম অভিমান, কাম ক্রোধ, ভোগ বিলাস গোবিন্দে বিলীন

হইয়া গিয়া এই আশ্চর্য্য গোবিন্দলাল সৃষ্ট হইয়াছে। বিষ প্রক্রিয়াগুণে ঔষধ হইয়া থাকে। গ্রাম্য "লাল" শব্দটি গোবিন্দ-প্রাপ্ত হইয়া গোবিন্দলাল-রূপ ত্যাগী মহাপুরুষ হইয়াছে।

গোবিন্দলালকে শেষে গোবিন্দ-পদে আত্মসমর্পণ করিয়া ভ্রমরের আকাঙ্ক্ষিত দেবতার আসন লাভ করিতে হইবে, তজ্জন্যই অন্তরের প্রচ্ছন্ন ভোগাকাঙ্ক্ষা তাহার সম্পূর্ণ মিটান আবশ্যক হইয়াছিল। ঐ আকাঙ্ক্ষারূপ পাপটি সমূলে উচ্ছিন্ন হইবে বলিয়া অমন প্রবলভাবে তাহার স্বরূপ-প্রকাশের প্রয়োজন হইয়াছিল। অগ্নিতাপে না গলিয়া যাইলে বিশুদ্ধ সুবর্ণের ভাস্বরদীপ্তি দেখা দেয় না। পাপের ফলভোগ না হইলে সাধনার মহিমা ফুটিয়া উঠিবে কেন?

গোবিন্দলালের জন্মান্তরীণ সাধনা ছিল, পিতা মাতা হইতে প্রাপ্ত শোণিতাদিও বিশুদ্ধ ছিল। নতুবা একজীবনে সমস্ত পাপ নিঃশেষে ভুক্ত হইয়া সাধনার এমন আশ্চর্য্য ফল দেখা দিত না। ভ্রমরের মত সতী সাধ্বীর ঐকান্তিক ইচ্ছাশক্তির যোগও আসিয়া মিলিত না। গোবিন্দলালের ইহকৃত পাপের সাধারণতঃ জলে ডুবিয়া আত্মহত্যারূপ ফল-প্রাপ্তিই স্বাভাবিক ছিল। আর কবি প্রথম সংস্করণে ঐরূপ ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন। পর সংস্করণে আবার ভগবচ্চরণে সর্ব্বকর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া মানব যে এক জীবনেই সাধনার গুণে কতদূর উন্নতি করিতে পারে, তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গেলেন। গোরিন্দলালের ইহকৃত পাপই ফলভোগে নিঃশেষিত। নিজের সাধনার ও ভ্রমরের ঐকান্তিক ইচ্ছাশক্তির যোগে নূতন পুণ্যজীবন প্রাদুর্ভূত। (দণ্ড-ভয়ে

দিবারাত্রি শঙ্কা, ছদ্মবেশে অবস্থিতি, হাজতগৃহে বাস, অপরাধীরূপে বিচারালয়ে উপস্থিতিই—এস্থলে পাপের ফলভোগ)।

গোবিন্দলাল জীবনের প্রভাতে আহ্লাদের পুত্তলি, জীবনের মধ্যাহ্নে ভোগের সেবক এবং জীবনের সায়াহ্নে পাপ ও অনুতাপে দগ্ধহৃদয়। জীবনের রাত্রিকালটি আঁধারে আচ্ছন্ন। মনে হয়, এই সময়ে প্রায়শ্চিত্ত, বিবেকের স্ফূর্ত্তি এবং সাধনার আরম্ভ, নচেৎ জীবনের ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গোলিন্দলালকে মহাপুরুষরূপে আমরা দেখিতে পাইতাম না।

"অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামমনন্যভাক্"।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥

গীতার এই তত্ত্বটি গোবিন্দলালে চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে। পাপী তাপী যে-ই ভগবানে আত্মসমর্পণ করিবে, শাশ্বতী শান্তি তাহারই। গোবিন্দলালের চরিত্র হইতে আমরা এই মহাশিক্ষালাভ করিয়াছি।

গোবিন্দলাল ধনীর সন্তান। সুখে লালিত পালিত; দুঃখ কাহাকে বলে জানে না। সুখে মানুষ হইলে মানুষের যে গুণ দেখা যায়, গোবিন্দলালে তাহা ভালরূপেই দেখা গিয়াছিল। দুঃখে যে শিক্ষা হয়, চিত্তের দৃঢ়তা, স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য জন্মে, তাহা অবশ্য তাহার দেখা যায় নাই। সুখ ও আমোদ মানুষকে চঞ্চল করে। পরের দুঃখবেদনা কি প্রকার, সুখী ব্যক্তি তাহা মনে প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারে না।

"চিরসুখী-জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিতবেদন বুঝিতে পারে?"

দুঃখশোকই মানুষকে পরদুঃখকাতর এবং সহানুভূতিময়চিত্ত করে। দুঃখশোক ব্যতিরেকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব গড়িয়া উঠে না। দুঃখবেদনা না পাইলে সীতা, সাবিত্রী বা দময়ন্তী গড়িত না। দুঃখ-শোক-শূন্য জীবন একটানা স্রোতের মত। স্থির নদীতে পাড়ি দিতে বালকেও পারে। সুখে সম্পদে ভাসিয়া যাওয়ায় মানবের কোন কৃতিত্ব প্রদর্শিত হয় না। জীবন একটী পরীক্ষা, সেই পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হওয়া না ঘটিল, তবে মানব-জন্মের উদ্দেশ্যই যে ব্যর্থ হইল।

বাল্যাবধি গোবিন্দলাল জ্যেঠামহাশয়ের নিকট পুত্রাধিক আদরই পাইয়া আসিয়াছে, পিতার অভাব কখন তাহাকে পাইতে হয় নাই। গুরুভার বলিয়া জ্যেঠামহাশয় প্রিয় গোবিন্দলালকে বিষয়কার্য্য হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্তই রাখিয়াছিলেন।

বধূ ভ্রমর শ্যামবর্ণ, মুখশ্রীটি তার বড়ই সুন্দর ছিল, আর লক্ষণটিও বড় ভাল ছিল, রাশিচক্রেরও আশ্চর্য্য রকম মিল হইয়াছিল। তাই কৃষ্ণকান্ত রায় তাহার সহিত একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দলালের বিবাহ দেন। জীবনে দুঃখকষ্ট যাহাই হউক না কেন, পরিণামে যখন গোবিন্দলালের জীবন ত্যাগে সার্থক ও কল্যাণে চরিতার্থ হইয়াছিল, আর ভ্রমর যখন তাহার কারণ, তখন ঐ বিবাহে যে যোগ্য মিলই হইয়াছিল, তাহা বলিতে হইবে। জন্ম, মৃত্যু আর বিবাহ, মানবের জন্মান্তরীণ কর্ম্মের ফলেই ঘটিয়া থাকে —ইহা আমাদের শাস্ত্রের কথা। গোবিন্দলালের কৈশোর বয়সে বিবাহ হয়। ভ্রমর তখন আটবৎসরের বালিকা মাত্র।

কিশোর ও বালিকার বিবাহে যেমন হয়—এ উহার খোঁপা

খুলিয়া দেয়, ও উহাঁর অঙ্গে জল ছিটাইয়া মারে। পশ্চাৎ হইতে চক্ষু চাপিয়া ধরা, হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পলাইয়া যাওয়া, ধরা পড়িয়া বাহু-আলিঙ্গনে বদ্ধ হওয়া—এ সকল প্রথম প্রেম-খেলার কিছুরই ক্রটী ছিল না।

এইরূপ ছেলেমানুষীর ভিতর দিয়াই গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের ভালবাসা জাগিয়া উঠিল। বয়সের ধর্ম্মে ভ্রমরকলিকা ফুটিল; ছেলেমানুষীটি কিন্তু সম্পূর্ণ লোপ পাইল না। চক্ষুর দৃষ্টি কটাক্ষে পরিণত হইল, ভ্রূর চলন ভ্রূভঙ্গীতে পরিবর্ত্তিত হইল, মুখের হাসিটি অধরের কোণে আসিয়া আশ্রয় লাভ করিল।

এইরূপে গোবিন্দলাল ভ্রমরকে লইয়া প্রেমের খেলা খেলিতে লাগিল। সন্ধ্যার সময়ে একবার বাহির বাড়ীতে—বেড়ানর উদ্দেশ্যে যাওয়া ব্যতীত ভ্রমরের সঙ্গ-ত্যাগ তাহার বড় দেখা যাইত না। বড়লোকের ছেলে বলিয়া সকলই মানাইয়া যাইত। ভ্রমরকে সংসার বড় দেখিতে হইত না। সাজিয়া গুজিয়া স্বামীর নিকট বসিয়া থাকা, গল্প আমোদ করা, ভালবাসার খেলায় মত্ত থাকা আর সোহাগ আদর আদায় করাই ভ্রমরের প্রধান কার্য্য ছিল। ভ্রমর লতার মত গোবিন্দলালের সর্ব্বাঙ্গ এমনভাবে দিবারাত্র বেষ্টন করিয়া থাকিত, সাধ্য কি, তাহা মুক্ত করিয়া গোবিন্দলাল অধিকক্ষণ কোথাও থাকে? এইরূপে দম্পতীর জীবন-তরী সুখ-বাতাসে পালের ভরে হেলিয়া দুলিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল।

"যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম"—

বিবাহমন্ত্রটি সার্থক হইল। কবির ভাষায় "কিছু মুক্ত, কিছু বা স্বাধীন" থাকা আর গোবিন্দলালের হইল না।

এত আদরে সোহাগে, এত আবদারে জুলুমে যাহা হয়, গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের তাহাই হইল। ভ্রমরের একটি পুত্রসন্তান হইয়া মারা গেল। বড় দুঃখের দিন না আসিলে সে কথা আমরা জানিতেও পারিতাম না। বলা বাহুল্য, সুখী দম্পতীর মনেও সে শোক স্থায়ী হয় নাই।

গোবিন্দলাল ভ্রমরের নিকট খেলার সামগ্রী, আমোদের বস্তুই ছিল। প্রণয়ীর প্রণয়-লাভেই সন্তুষ্ট হইয়া গোবিন্দলালকে যে পতিদেবতার প্রাপ্য পূজালাভে বঞ্চিত থাকিতে হইয়াছিল— তাহা আমরা বলিতে পারি। অত আবদার, অত সোহাগ ও অত হুড়াহুড়ির মধ্যে দেবতার ভাব জন্মে না। ভ্রমরের ভিতর দাসীভাবটি আদৌ ফুটিতে দেখে নাই বলিয়াই গোবিন্দলাল, ভ্রমর আপনাকে যখন দাসানুদাসী বলিয়া অভিহিত করিল, তখন তাহা বিশ্বাস করিতে পারে নাই।

গোবিন্দলাল ভ্রমরকে মনের মত প্রণয়িনী, যৌবনের বিলাসিনী, প্রেমের পুত্তলি আর ভোগের রাণী করিয়াই গড়িয়া লইয়াছিল; রহস্তে সখী, ললিতকলাব্যাপারে প্রিয় শিষ্যাই করিয়া তুলিয়া ছিল; কিন্তু গৃহস্থ-গৃহের গৃহিণী, ধর্ম্মাচরণে সহধর্ম্মিণী, পরামর্শে সচিবস্থানীয়া করিবার জন্য আদৌ যত্ন করে নাই। এ দোষ গোবিন্দলালের। দম্পতীর উচ্ছ্বাসতরঙ্গিত জীবন-পথে আচম্বিতে আসিয়া পড়িল রোহিণী। রাজা ও রাজলক্ষ্মীর মাঝখানে অলক্ষ্মীর মত তাহার আগমনটি দম্পতীর জীবনে একটি বিষম পরিবর্ত্তন আনিয়া দিল।

গোবিন্দলাল সরোবরের ঘাটে রোহিণীর মুখে তাহার ভাল-

বাসার কাহিনী শুনিল, রোহিণীর কান্নায় গোবিন্দলালের হৃদয়ে একটি কোমল ভাবের সঞ্চার হইল। "সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র, আবার সেই মুখ তাহারই জন্য অশ্রুনিষিক্ত, দয়াপ্রাণ গোবিন্দ-লালের হৃদয় সহানুভূতিতে উদ্বেল হইয়া উঠিল। বিপন্নাকে উদ্ধার করিবার প্রতিশ্রুতি-দান গোবিন্দলালের উদার হৃদয়ের অভিব্যক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সুন্দরী নারী ভালবাসে—প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে—জানিলে সাধারণতঃ হৃদয়ে আহ্লাদ ও সমবেদনার ভাব জাগাই স্বাভাবিক। গোবিন্দলালের চিত্তে আহ্লাদ হইল না, সমুদ্রবৎ তাহার হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া দয়ার উচ্ছ্বাস উঠিল। এরূপক্ষেত্রে আহ্লাদ কিম্বা ক্রোধ অথবা ঘৃণাই সাধারণতঃ হইয়া থাকে।

একটি নিরীহ সরল প্রাণী পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পড়িয়া ধীরে ধীরে প্রলোভনের কণ্টকজালে জড়াইয়া পড়িল। ইহার জন্য গোবিন্দলাল অজ্ঞানতঃই সম্পূর্ণ দোষী ; জ্ঞানতঃ নহে।

তারপর স্বচ্ছস্ফটিকমণ্ডিত হৈমপ্রতিমার ন্যায় জলতলে শয়ান রোহিণীকে উদ্ধার, তার সেই ফুল্ল-রক্তকুসুমকান্তি অধরযুগলে অধরযুগল স্থাপিত করিয়া ফুৎকার দান, শেষে প্রভাত-শুক্ররূপিনী রূপসৌন্দর্য্যের রাণী—কামনার অধিদেবতা রোহিণীর মুখে * * * "চিরকাল ধরিয়া দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে রাত্রি দিন মরার চেয়ে একেবারে মরা ভাল" প্রেমগর্ভ ব্যথাদিগ্ধ এই বাণী,—অতৃপ্তকাম গোবিন্দলাল আপনাকে সংযত রাখিবার চেষ্টা পাইল। জলন্ত বিদ্যুৎশিখাসদৃশী রোহিণী আপনার বৈদ্যুতিক স্পর্শে গোবিন্দলালের চিত্তে একটি তীব্রস্পন্দন

ছুটাইয়াছে। গোবিন্দলাল কি করিল? বিজন কক্ষমধ্যে ভূপতিত ও ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া "নাথ, এ বিপদে আমায় রক্ষা কর" বলিয়া ভগবানের নিকট করুণ প্রার্থনা করিল। চিত্তসংযমের জন্য এরূপ করুণ প্রার্থনা যে করিতে পারে, প্রেমময়ী সুন্দরী নারীর ভালবাসার মোহ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যে ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়া এরূপভাবে ক্রন্দন করিতে পারে, প্রকৃত চিত্তজয়রূপ সন্ন্যাস-পথ পরিণামে তাহারই ভবিষ্যতের ফলকে বীজরূপেই এই ভাবেই কখন কখন ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায়।

আকর্ষণের প্রতি-আকর্ষণ আছে। প্রণয়ের স্মৃতি বা মোহের বেগ যতই দূর করিবার চেষ্টা করা যায়, ততই ঐ স্মৃতি চাপিয়া বসে, ততই ঐ বেগ প্রখর হইয়া উঠে। রোহিণীর মোহের আকর্ষণ এত প্রবল যে, গোবিন্দলালের হৃদয়-প্রস্ফুটিত প্রেমপুষ্পটি ছিন্নবন্ধন হইয়া সহসা ধূলায় লুটাইল। রাহুর ইহা সর্ব্বগ্রাস।

গোবিন্দলাল অনেক রাত্রিতে উদ্যানবাটিকা হইতে গৃহে ফিরিয়া রোহিণীর জলমজ্জনের কথা ভ্রমরকে বলিল না। আপনার হৃদয়ের দুর্ব্বলতাটুকু না জন্মিলে, না বলার সঙ্কোচটুকু গোবিন্দলালের আর থাকিত না। "রোহিণী ভালবাসে," রহস্যচ্ছলে গোবিন্দলালই একদিন ভ্রমরকে একথা বলিয়াছিল বটে, কিন্তু নিজে আজ মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছে তাই তাহার মুখে কোন কথাই ফুটিল না। রাত্রি কেন অধিক হইল, ইহার কারণটি ভ্রমর শুনিতে চাহিল, গোবিন্দলাল "আর একদিন বলিব বলিয়া" স্তোকবাক্যে তাহাকে ভুলাইয়া রাখিল। ভ্রমর কি ভুলিল ভুলিল না। সন্দেহের বীজটি তাহার মর্ম্মতলে সাবধানে উপ্তই হইয়া রহিল।

অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় গোপন করিলে ভবিষ্যতে অনেক সময়েই তাহা সর্ব্বনাশেরই কারণ হইয়া থাকে। এই উদ্যানের ব্যাপারটি যদি ভ্রমরের নিকট গোপন রাখা না হইত, তাহা হইলে প্রতি-বেশিনীদের কুৎসায় বা রোহিণীর ছলনায় ভ্রমর অভিমানে আত্মহারাও হইত না, ঈর্ষ্যা ক্রোধ বা অন্যায়াসহিষ্ণুতায় গোবিন্দ-লালকে অমন তিক্ত পত্র লিখিয়া পিত্রালয়ে গিয়া বসিয়াও থাকিত না। ঐ একটী ক্ষুদ্র ঘটনার প্রকাশ করিলে হয়ত চক্র অন্যরকমে ঘুরিয়া যাইত।

গোবিন্দলাল "ভ্রমরের নিকট অবিশ্বাসী হইব না" বলিয়া রোহিণীকে ভুলিবার জন্য কি চেষ্টা না করিল? চক্ষুর অন্তরালে থাকিলে নিজের মন স্থির হইতে পারে, রোহিণীরও চিত্তের মোহ কাটিয়া যাইতে পারে, ইহা ভাবিয়া প্রবাসে গেল। যে কখন একদিনের তরে গৃহ বা ভ্রমরকে ছাড়িয়া যায় নাই, আর আজ সুদীর্ঘ প্রবাসগমনের ক্লেশ অক্লেশে বরণ করিয়া লইল। জমীদারীদর্শন একটী ছল মাত্র। পূর্ণ যৌবন, প্রখর মনোবৃত্তি, বলবতী রূপতৃষ্ণা আর রূপসৌন্দর্য্যশালিনী রোহিণীর মোহিনীর বেশে আত্মসমর্পণে ঔৎসুক্য—"একৈকমপ্যনর্থায় কিমু যত্র চতুষ্টয়ং।" গোবিন্দলাল চিত্তজয়ের জন্য আপনার, ভ্রমরের এবং রোহিণীরও ভালর জন্য দেশ ত্যাগ করিল। ইহা কয়জন করে বা পারে? কলঙ্কের ভয়ে পলায়ন করিলে গোবিন্দলালের দুর্ব্বলতা এবং কাপুরুষতারই পরিচয় পরিস্ফুট হইত বটে কিন্তু বিদেশ যাত্রার পূর্ব্বে ত আর কলঙ্কের কোন আভাসই গোবিন্দলাল শুনিয়া যায় নাই।

নিদাঘের নীল মেঘমালার মত রোহিণীর রূপ এই নবীন চাতকের লোচনপুটে ফুটিয়া উঠিল। রূপের অপূর্ব্ব ছটা দেখিতে দেখিতে, প্রথম বর্ষায় মেঘদর্শনে চঞ্চলা ময়ূরীর মত গোবিন্দ-লালের অতৃপ্ত মন নাচিতে লাগিল। তখনও গোবিন্দলাল ভাবিল, "মরিতে হয় মরিব, তথাপি ভ্রমরের নিকট অবিশ্বাসী ও কৃতঘ্ন হইব না।" অকলঙ্কিত চরিত্র, অত্যাজ্য ধর্ম্ম বা অপরিহেয় সমাজের কথা এমন কি ভগবানের নিয়মের এতবড় অপব্যবহারের কথাও গোবিন্দলালের হৃদয়ে জাগিল না, জাগিল ভ্রমরের নিকট অবিশ্বাসী ও কৃতঘ্ন হইব কি প্রকারে? কাজেই যখন ক্রোধ ও অভিমানের বন্যায় ভ্রমর ভাসিয়া গেল, তখন আর কোন বাধা বা সঙ্কোচই রহিল না।

গোবিন্দলাল এ জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইলেও জয়ী হইতে পারিত, কিন্তু ভ্রমরের তিক্তপত্র তাহার কাল হইল। সে পত্র রোহিণীর সহিত কুৎসিত আসক্তির ইঙ্গিতে বড় তীক্ষ্ণ, বড় মর্ম্মচ্ছেদী। ফিরিবার অপেক্ষা করা নয়, সত্য মিথ্যা জিজ্ঞাসা করা নয়—অমনই একেবারে ভ্রমর পিত্রালয়ে প্রস্থান করিল। গোবিন্দলাল সমুদ্রবৎ হৃদয় লইয়া ভ্রমর-নদীটিকে বক্ষের ভিতর টানিয়া লইবার জন্য ব্যাকুল, আর সে কিনা গোঁ-ভরে মুখ ফিরাইয়া সরিয়া গেল! এ তাচ্ছিল্য, এ অপমান গোবিন্দলালের বক্ষে বড় বাজিল। তখন রোহিণীর অগ্নিশিখাময়ী মূর্ত্তি জলজ্বল করিতে করিতে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভ্রমরের লজ্জানম্র ম্লান মূর্ত্তিটি তৎক্ষণাৎ সঙ্কুচিত হইয়া একপার্শ্বে দাড়াইয়া রহিল।

গোবিন্দলাল ফিরিয়া আসিয়া রোহিণীর মুখে শুনিল, ভ্রমরই

তাহার কুৎসা রটনা করিয়া গিয়াছে। মুগ্ধ অভিমানান্ধ যুবক অমনই তাহা বিশ্বাস করিল। সত্য মিথ্যা পরীক্ষার কথা মনে জাগিল না। রোহিণী রূপের পশরা লইয়া দাঁড়াইয়াছে, তৃষ্ণার্ত্ত অধরে মদিরা ঢালিয়া দিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। মুগ্ধ অভিমানান্ধ যুবকের মনোবৃত্তি সেই দিকেই চলিয়া পড়িল।

নিয়তির পথ সর্ব্বত্রই বিঘ্নশূন্য। গোবিন্দলালের জ্যেঠামহাশয়ের অকস্মাৎ পরলোক-গমন ঘটিল। ভবিষ্যৎ ভাল হইবে মনে করিয়া কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালের বৈষয়িক অংশ মৃত্যুর পূর্ব্বে উইল করিয়া ভ্রমরকে দিয়া গেলেন। প্রবীণ বিষয়ী এস্থলে ভুলই করিলেন। রোহিণী ঘটিত ব্যাপারটি অবশ্য সত্য বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, নতুবা এমন উইল তিনি করিলেন কেন?

কৃষ্ণকান্তের শ্রাদ্ধের সময়ে ভ্রমর আসিল। আসিয়াই দেখিল, সে গোবিন্দলাল আর নাই। "তে হি নো দিবসা গতাঃ" সে দিন চলিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বের সে ভালবাসা কই? সে রঙ্গরস কই? সে সময়ে অসময়ে তামাসা কৌতুক কই? ভ্রমর প্রাপ্ত সম্পত্তি গোবিন্দলালকে দানপত্র লিখিয়া দিল। অসময়ে বাপের বাড়ী যাইবার জন্য ক্ষমা চাহিল, পায়ে ধরিয়া কতই কান্না কাঁদিল, কিন্তু সকলই বৃথা। কবিই বলিয়াছেন "যাহা ভাঙ্গে তাহা গড়ে না।" গড়ে না—অর্থাৎ গড়িয়া উঠে না!

গোবিন্দলাল তখন রোহিণীর রূপভোগলালসায় উন্মত্ত। অবশ্য উন্মত্ততা না থাকিলে ভ্রমরের করুণ ক্রন্দনে অবশ্যই তাহার মন গলিত। এদিকে ভ্রমর দারুণ অভিমানবশে পিত্রালয়-গমনরূপ তাচ্ছিল্য না দেখাইলে গোবিন্দলাল কখনও ভ্রমরকে

ত্যাগ করিয়া রোহিণীকে লইয়া ভাসিত না। দুইটীই পরস্পরসাপেক্ষ।

গোবিন্দলাল দেখিল—রোহিণী তাহার জন্য উইল ফিরাইয়া দিতে আসিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক চোর অপবাদ লইল, তাহাকে পাইবার আশায় নিরাশ হইয়া আত্মহত্যা করিবার জন্য পুষ্করণীর জলে গিয়া ডুবিল, আর এখন তাহারই জন্য লোকনিন্দা সহ্য করিয়া গ্রামের মধ্যে অপমানিত জীবন যাপন করিতেছে; গোবিন্দলালের হৃদয় কৃতজ্ঞতায়, দয়ায় ও সমবেদনায় ভরিয়া গেল। যে-জীবন রক্ষা করা যায়, তাহার উপর জীবনদাতার বড় মায়া। এইগুলিই অতৃপ্ত রূপভোগ-লালসার সহিত মিশিয়া অনুরাগে পরিণতি লাভ করিল। রোহিণীর প্রতি আকর্ষণ অনুরাগটিকে বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। এইসময়ে ভ্রমরের উপর ক্রোধ ও অভিমান আসিয়া জুটিল। বাধাও তখন আর রহিল না।

রোহিণীর মোহ-ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া ভ্রমরের ভালবাসার তরীটি পাল ছিঁড়িয়া কোথায় ভাসিয়া গেল। ভ্রমর গোবিন্দলালের মুখে শুনিল—"তোমাকে আমি ত্যাগ করিলাম"।

গোবিন্দলাল মাকে কাশী পৌঁছাইয়া দিয়া আর ফিরিলনা। রোহিণীও তারকেশ্বরে হত্যা দিবার ছল করিয়া গৃহ ত্যাগ করিয়া গেল। বলা বাহুল্য, উভয়ে সঙ্কেতস্থানে মিলিত হইয়া প্রসাদপুরের কুটীরে স্বামীস্ত্রীভাবে বসবাস করিতে লাগিল।

গোবিন্দলাল ওস্তাদের নিকট বাজনা শেখে। রোহিণী গীত-বিদ্যা অভ্যাস করে। সেই সময়ের একটি চিত্র দেখিলাম—গোবিন্দলাল রোহিণীর চঞ্চল কটাক্ষপ্রতি অনিমেষ দৃষ্টি স্থাপিত

করিয়া রহিয়াছে। গোবিন্দলালের রূপমোহ তখনও যে কাটে নাই, ইহা বুঝিতে পারা গেল।

নিশাকর মাধবীনাথের বন্ধু। বন্ধুর হিতের জন্য রাসবিহারীর ছদ্মবেশে গোবিন্দলালের সহিত সাক্ষাৎ করিল, ভ্রমরের কথা তুলিয়া ও বিষয়পত্তনির কথা পাড়িয়া আলাপ করিয়া গেল। কু-কার্য্য করিয়া আসিয়াছে বলিয়া আপনার উপর লজ্জা ও ধিক্কারের জন্যই গোবিন্দলাল বড় কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করে না। ভ্রমরের স্বামী এখন রোহিণীর সংসর্গে আসিয়া মদ্য পান করে। রোহিণী-নেশার উপর মদের নেশা গোবিন্দলালকে তিক্তস্বভাব ও অপ্রকৃতিস্থ করিয়া তুলিয়াছে।

ভ্রমরের কথা উঠিয়াছে—এতদিনের পর গোবিন্দলালের তাল কাটিল, বাজনা ভাল লাগিল না। ঘুমাইবার ছলে অন্য গৃহে যাইয়া, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া গোবিন্দলাল বালকের মত কাঁদিতে বসিল।

গোবিন্দলাল কাঁদিল কেন? হরিদ্রাগ্রামে মুখ দেখাইবার যো নাই, ভ্রমরের নিকট ফিরিয়া যাইবার উপায় নাই—তাহা ত অনেক দিনই জানা আছে; তবে এমন কি নূতন ঘটনা ঘটিল—যাহাতে গোবিন্দলাল কাঁদিল?—

নিশাকর বলিয়াছে "আপনার ভার্য্যা ভ্রমর দাসী আমাকে বিষয় পত্তনি দিতে স্বীকৃতা হইয়াছেন, কিন্তু আপনার অনুমতি-সাপেক্ষ। তিনি আপনার ঠিকানা জানেন না, পত্রাদি লিখিতে ইচ্ছুকও নন।" এই কথা কয়টি শুনিয়া গোবিন্দলালের মনে এইরূপ চিন্তা আসাই স্বাভাবিক, যথা :—

প্রথমত ঃ—বিষয় ভ্রমরের, তথাপি সে স্বামী বলিয়া এখনও অনুমতির অপেক্ষা রাখে।

দ্বিতীয়ত ঃ—"ঠিকানা জানেন না"। উঃ, ভ্রমরকে ঠিকানা পর্য্যন্ত জানাইবার সম্বন্ধটুকুও লোপ পাইয়াছে!

তৃতীয়ত ঃ—"পত্রাদি লিখিতেও ইচ্ছুক নন।" গোবিন্দলালের বড় ভরসা ছিল, ভ্রমর তাহাকে একদিন ক্ষমা করিবেই। ভালবাসার পাত্রের নিকট এইরূপ দাবী অস্বাভাবিক নহে। ভালবাসার পাত্র শত অপরাধ করিয়া বহুদিন চক্ষুর অন্তরালে থাকিলে তাহার উপর ক্রোধ বা অভিমান দূর হইয়া যায়, স্নেহই জাগিয়া থাকে। ইহা স্নেহেরই ধর্ম্ম।

ভালবাসার নিয়ম না মানিয়া ভ্রমরই যখন ক্ষমা করিল না, তখন অন্য কোথাও আর ক্ষমা মিলিবার সম্ভাবনা নাই। এ পাপ তবে কি ক্ষমারও অযোগ্য ?—

এই প্রকারে ভাবনা ও স্মৃতি, প্রেম ও কাম, বিবেক ও মোহ, আশা ও নৈরাশ্যের সংঘর্ষ গোবিন্দলালের চিত্তে একটি আলোড়ন আনিয়া দিল। রূপতৃষ্ণা এতদিনে কতকটা মিটিয়া আসিয়াছে, নিরন্তর ভোগতৃপ্তিতে মোহের বেগ মন্দীভূত হইয়াছে, আর বহুদিনের অদর্শনে ভ্রমরের প্রেমময়ী মূর্ত্তিটিও আজি নূতন মূর্ত্তিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাপ ও শৈত্যের অসমমিলনে কাশির উদ্ভব। বিরুদ্ধ ভাবসমূহের সংঘর্ষে গোবিন্দলালেরও এই ক্রন্দন।

গোবিন্দলাল চক্ষুর উপর দেখিল—রোহিণী অবিশ্বাসিনী, রাত্রে পরপুরুষ রাসবিহারীর (নিশাকর) সহিত নিভৃতে আলাপরতা। যে-রোহিণীর জন্য অকলঙ্কিত চরিত্র, অত্যাজ্য ধর্ম্ম ও ভ্রমরকে

পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, সেই রোহিণী বিশ্বাসঘাতিনী!—গোবিন্দলাল উপযুক্ত দণ্ড দিবার জন্য তাহাকে গৃহে ডাকিয়া আনিল। বিচারকের মত মৃত্যুদণ্ড দিবার জন্য পিস্তল তুলিয়া ধরিল। গোবিন্দলাল যে উত্তেজিত হয় নাই, এমন বলা যায় না, তথাপি সেই উত্তেজনার মধ্যেও যে একটি স্থৈর্য্য ছিল, সেই কারণে হত্যা হইলেও ইহাকে দণ্ড নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।

পলায়ন, হাজতবাস, বিচারাদি হইয়া গেল। গোবিন্দলাল আইনের ফাঁকিতে, সাক্ষীদের গোলমালে ও প্রমাণাভাবে, বিচারে মুক্তিলাভ করিল।

সতীবাক্য বিফল হয় না। গোবিন্দলাল সুদীর্ঘ সাত বৎসরের পরে ভ্রমরের মৃতুকালে আজ উপস্থিত। কবি জানাইয়াছেন—"নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে গোবিন্দলাল নিজ গৃহে চোরের মত" আসিয়া দাঁড়াইল; ভ্রমর বসিতে বলিলে তবে বসিল। হত্যাকারী, ভ্রমরের মৃত্যুর কারণ হইয়া কোন্ সাহসে সতীর অঙ্গ স্পর্শ করিবে? ভ্রমর পতির পদধূলি লইয়া যখন মার্জ্জনা চাহিল "আশীর্ব্বাদ করিও যেন জন্মান্তরে সুখী হই," তখন অনুতপ্ত ও মর্ম্মাহত গোবিন্দলাল উন্মত্তবৎ কাঁদিয়া উঠিল। যে নিজে মার্জ্জনা করিবার অধিকারিণী, সে আজ মার্জ্জনা চাহিতেছে!

ভ্রমর "জন্মান্তরে সুখী হই" ইহাই চাহিয়াছে। "জন্মান্তরে যেন তোমাকে পাই" সতী সাধ্বী মনে মনে ইহা চাহিলেও মুখ ফুটিয়া কিন্তু বলিয়া যায় নাই। ভ্রমরের মুখে এ আশ্বাসের বাণী শুনিবার গোবিন্দলাল এখনও অধিকারী হয় নাই। মুখ ফুটিয়া ভ্রমরের ক্ষমা করিয়া না যাওয়াই গোবিন্দলালের পক্ষে ভালই হইয়াছিল।

ভ্রমর জীবিতকালে স্বামীকে যেমনটি দেখিতে চাহিয়াছিল, তাহা দেখিয়া যাইতে পারে নাই, কিন্তু মৃত্যুর পরে স্বর্গে সতী-কুঞ্জে থাকিয়া অবশ্যই তাহা দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। স্বামীর জড়দেহ অপেক্ষা তাঁহার দেবত্বই ভ্রমরের অধিক আকাঙ্ক্ষিত ছিল। সেই দেবত্ব এবং তদপেক্ষা আরও শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিয়া গোবিন্দলাল ভবিষ্যতে সর্ব্বত্যাগী, ভগবদ্‌গতপ্রাণ, শেষে গোবিন্দে লাল হইয়া উঠিল। ভ্রমর অপেক্ষা মধুর ও পবিত্র সামগ্রী পাইয়া গোবিন্দলাল ভবিষ্যদ্-জীবনে আদর্শপুরুষে পরিণত হইয়া দেশের শিক্ষারস্থল হইয়া রহিল।

আত্মহত্যাতে গোবিন্দলালের শেষ পরিণতি—এ কল্পনা বিশেষত্বহীন ও সাধারণ। আর এই সন্ন্যাস ও সর্ব্বত্যাগে যে পরিণতি, তাহা অত্যাশ্চর্য্যময়, অপূর্ব্ব ও সুন্দর।

রজনী।

"রজনী" পুস্তকখানির নায়িকার নামেই নামকরণ। ইহা নায়িকাপ্রধান উপন্যাস। উপন্যাসোক্ত নায়ক নায়িকা প্রভৃতির স্বমুখোচ্চারিত কাহিনীর কয়েকটি ফুলে "রজনী"-মালাখানি প্রস্তুত হইয়াছে। সাধারণতঃ, উপন্যাসে গ্রন্থকার নিজেই নায়ক নায়িকাদের চরিত্র কতকটা ফুটাইয়া থাকেন। কিন্তু এতজ্জাতীয় উপন্যাসে নায়ক নায়িকাদের স্ব স্ব চরিত্র আপনা-দিগকেই ফুটাইয়া তুলিতে হয়। এজন্য বড় সাবধানে গ্রন্থকারের পদবিক্ষেপ করার আবশ্যক পড়ে। নায়ক নায়িকারা নিজেরাই বক্তা বলিয়া চরিত্রগুলি একটু বাড়াবাড়ি রকমেই ফুটে। অধিকতর প্রগল্‌ভ ও বিশেষ রসভাবজ্ঞ না করিলে এই চরিত্রগুলি সম্যক্ বিকশিত হইয়া উঠে না।

বিশেষ বিপদ্ নবীনা নায়িকার। কোথায় আদরে সোহাগে অল্পে অল্পে ফুটিবে, কোথায় লজ্জারক্ত মুখখানি ধীরে ধীরে খুলিবে, অন্তর্নিরুদ্ধ সুকুমার ভাবগুলি কোথায় একটু একটু করিয়া বাহিরে প্রকাশ করিবে, তা নয়—নায়িকা আপনিই মুখ খুলিয়া প্রগল্‌ভার মত কোথায়ও বা নির্লজ্জার মত আপনাকে জাহির করিতেছে, নিরূদ্ধ ভাবগুলি সবলে আকর্ষণ করিয়া নগ্নভাবে লোকচক্ষুতে ধরিয়া দিতেছে; ইহা যেন সাধারণ বিচারে তেমন ভাল হয় না। ফুলশয্যার রাত্রিতে কিশোরী বধু যাচিয়া সাধিয়া

বরের সঙ্গে কথা কহিবে কিম্বা "দেহি পদপল্লবমুদারং" বলিয়া বরের মানভঞ্জন করিবে, ইহা শোভা পায় না। নবীন প্রণয়ের আস্বাদ পাইতে না পাইতে নবীনা প্রণয়িনীকে যদি পাকা গৃহিণী সাজিতে হয়, তাহা হইলে তেমন মাধুর্য্য ফুটে কি? নব নব ভাবগুলি—যাহা কিছু অব্যক্ত, বা অস্ফুট থাকার কথা, তাহা না হইয়া যদি সুব্যক্ত ও সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়, তাহাতে তাহার স্বাভাবিক বিশিষ্টতা তেমন দেখা যায় কি? রজনীচরিত্রে কিন্তু তাহাই হইয়াছে। এই-জাতীয় চরিত্রের ইহাই বিশেষত্ব।

অতিনিপুণ, চরিতরহস্যবিৎ গ্রন্থকার ব্যতীত এই প্রকার চরিত্র-অঙ্কন সকলে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্কিমচন্দ্র" বলিয়াই এই নূতন পথে চলিয়া বঙ্গসাহিত্যের একটি অপরূপ অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আশ্চর্য্যরকমে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন।

রজনীচরিত্রে পাছে ত্রুটি হয়, পাছে তার স্বাভাবিকত্ব ক্ষুণ্ণ হয়, প্রগল্‌ভতা ও নির্লজ্জতাটুকু পাছে অশোভন হয়, তাই অমর কবি রজনীকে উনিশ বৎসরের পূর্ণ-যুবতীরূপে দাঁড় করাইয়াছেন; অন্ধ করিয়া চক্ষুলজ্জাটুকু জন্মাইতে দেন নাই; দরিদ্র ফুলওয়ালী-রূপে বাহির করিয়া অশোভনত্বটুকুও রাখেন নাই। ভিতরে বুভুক্ষু প্রেমপূর্ণ হৃদয় পুরিয়া, বিবাহ না দিয়া অবিবাহিতা রাখিয়া, পূর্ণ-যৌবনায় এই ভাবপ্রবণতা এবং প্রেমব্যাকুলতাটি বেশ মানাইয়া খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে এই "অশিক্ষিত পটুত্ব," যুবতী-জনোচিত ছলাকলা ও কৌশল আর নবপ্রণয়োন্মত্ততা, বঙ্গরমণী বলিয়াই অবশ্য কিয়দংশে অপ্রাকৃতিক বলিয়াই বোধ হয়। যাহা সচরাচর হইয়া থাকে, তাহাই

দেখাইতে হইবে, এমত নহে। যাহা হইতে পারে, যাহাতে যাহাতে সৃষ্টিকৌশল ও অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য—তাহা প্রদর্শন করাই সৃষ্টিকুশল কবির কার্য্য।

রজনী অর্থে রাত্রি। রাত্রির দুইটী মূর্ত্তি, এক আঁধারময়ী গম্ভীর মূর্ত্তি, আর জ্যোৎস্নাময়ী মধুর মূর্ত্তি। রজনী প্রথম জন্মান্ধ ও দুঃখিনী, পরিশেষে চক্ষুষ্মতী ও সুখিনী। যখন দুঃখিনী তখন তাহার অন্ধতা বাহিরের অন্ধকারের মত। অভ্যন্তরেও ঘন অন্ধকাররাশির মত তার হৃদয়ভরা দুঃখ। যখন সুখিনী—তখন অন্তরের সুখ, মুখের হাসি, প্রাণের উচ্ছ্বাস আর চক্ষুর কটাক্ষ জ্যোৎস্নাধারার মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে।—ভিতরে কি নির্বৃতি ঘন আনন্দরসের লীলা! রজনী তখন বিষয়সম্পত্তির অধিকারিণী, শচীন্দ্রের ভালবাসার পাত্রী, শ্বশুরগৃহের লক্ষ্মী, শেষে অমরপ্রসাদের জনয়িত্রী। তখন বাহিরেও জ্যোৎস্নার মাধুরী। অঙ্গে অঙ্গে বাসন্তী লতার কমনীয়তা, নয়নে অধরে অমৃতের তরলতা আর চিত্তে পূর্ণতোয়া তটিনীর কল কল উচ্ছ্বাস। সে আঁধারময়ী রজনী এখন জ্যোৎস্নাময়ী। সে গ্রীষ্মতপ্ত শ্রী আজ স্নিগ্ধকরী শারদীয়া শোভা।

সুখ দুঃখ, প্রেম ভক্তি, লজ্জা ভয়—সমস্তই মনের বৃত্তি। "* * * হ্রী ধী র্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব।" মনের বৃত্তি দার্শনিকগণের মতে, মনের পরিণাম বা মনের বিকার মাত্র। মনই চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া নির্গত হইয়া তত্তৎ (দ্রষ্টব্যশ্রোতব্য) বস্তুর আকার ধারণ করে। দর্শন শ্রবণাদির (বেদান্তমতে) ইহাই কারণ। স্থূল ইন্দ্রিয়কে দ্বার না করিয়া মন যেস্থানে দর্শন

স্পর্শনাদি করিয়া থাকে; সেস্থানে স্থূল ইন্দ্রিয়ের ঐহিক সংস্কার বা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সাহায্যের আবশ্যক হয়। জন্মান্তরীণ সংস্কার বা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অবশ্য কখনও কোন জন্মান্ধ স্বপ্নে দেবদর্শন করিয়া থাকে, জন্মবধির অস্ফুট স্বর্গ-সঙ্গীত শুনিয়া থাকে,—ইহা সাধারণ সিদ্ধান্ত নহে। রজনী জন্মান্ধ, ইহকালে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বা ইন্দ্রিয়ের সংস্কার লইয়া তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ জন্মিবার কথা নহে; তাই তাহার মুখে অন্তরের তৃষার্ত্ত হাহাকার শুনিতে পাইলাম—

"দেখা কি? দেখা কেমন? এক মুহূর্ত্তের জন্য এই সুখময় স্পর্শ দেখিতে পাই না?" অন্ধের প্রত্যক্ষ দর্শনের স্পষ্ট আকার সম্বন্ধে কোন প্রস্ফুট ধারণা নাই; তাই সুখময় স্পর্শ দেখিতে পাই না" এই নূতন কথাটি শুনিতে পাইলাম। "দেখা মা, বাহিরের চক্ষু নিমীলিত থাকে থাকুক মা, (বাহ্য চক্ষু রজনী যে চাহে না তাহা নহে, তবে আকাশের চাঁদের মত যাহা পাইবার নহে, বুদ্ধিমতী তাহা চাহিবে কেন?) "আমার হৃদয়ের মধ্যে চক্ষু ফুটাইয়া দে, আমি একবার অন্তরের ভিতর অন্তর লুকাইয়া মনের সাধে রূপ দেখে, নারীজন্ম সার্থক করি।"

রজনী অন্ধ বলিয়া তাহার শ্রবণ ও স্পর্শশক্তি চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদের অপেক্ষা অধিক তীক্ষ্ণ। একটি ইন্দ্রিয়ের শক্তি (তত্তৎবিষয়-সম্বন্ধ বশতঃ) ব্যয়িত না হওয়ায় অপর ইন্দ্রিয়ের শক্তি বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। যাহার চক্ষু আছে, সে কোন বস্তু দেখিয়াই পছন্দ করে, ভালবাসে। যাহার চক্ষু নাই, তাহাকে শুনিয়া বা স্পর্শ করিয়াই যে কোন বস্তু পছন্দ করিতে হইবে বা ভালবাসিতে হইবে; তাই রজনীর

সমস্ত মন, স্পর্শের ভিতর দিয়াই শচীন্দ্রের একটি মনগড়া আকার ধারণা করিয়াছে ; তাই মুগ্ধা নারী শচীন্দ্রের করস্পর্শে যুথি জাতি মল্লিকা গোলাপের গন্ধের আঘ্রাণ পাইয়াছে ; তাই শচীন্দ্রের চরণ-ক্ষেপে উদ্ভূত অস্ফুট (রজনীর কাছে স্ফুট) ধ্বনির মধ্যে জীবনের আকাঙ্ক্ষিত সুখসঙ্গীতের তাল অনুভব করিয়াছে।

প্রথম সুপুরুষ-দর্শনে অনুরাগের সঞ্চার যেমন দেখা যায়, প্রথম সুপুরুষ-সংস্পর্শেও অনুরাগের সঞ্চার তেমনই দেখা যাইবে। স্পর্শে স্পর্শে, চক্ষুষ্মান্ সংযতচরিত্র ব্যক্তিরও ইন্দ্রিয় বিমূঢ়, চিত্ত বিকারপ্রাপ্ত ও চেতনা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া থাকে। শচীন্দ্রের সদয়ধৃত চিবুকস্পর্শে যে, রজনী বিমুগ্ধা হইবে, আশ্চর্য্য কি ? সকলের উপেক্ষিতা ও অনাদৃতা রজনীর জীবন যৌবন, এক শচীন্দ্রের সহানুভূতিতেই একদিনে নূতন ভাবে ফুটিয়া উঠিল। অন্তরের রুদ্ধ কোণে লুক্কায়িত কামনাপ্রবৃত্তি মায়াবীর ইন্দ্রজালযষ্টির স্পর্শে নিদ্রিত রাজকুমারীর মত সহসা জাগরিত হইয়া উঠিল। রজনী পূর্ণ যুবতী, আকর্ষণের পূর্ণ প্রভাবই তাহাতে পরিলক্ষিত,—তাই সে বলিতে পারিয়াছিল—

"কাণার সুখ দুঃখ তোমরা বুঝিবে না। সে নবনীত-সুকুমার পুষ্পগন্ধময় বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ তোমরা বুঝিবে না।"

সত্যই স্পর্শকে আমরা পুষ্পগন্ধময় বীণাধ্বনিবৎ বুঝি না, বুঝিতে পারিও না। চক্ষু নাই বলিয়া স্পর্শের যে পরিপূর্ণ শক্তি রজনী পাইয়াছিল, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি তাহা পাইবে কোথা হইতে ? রজনীর কথায় বুঝিতে পারিলাম, ভগবান্ চক্ষু দিয়া যেমন নর-নারীকে কৃতার্থ করিয়াছেন, সেইরূপ স্পর্শ-শ্রবণাদি অপরিপূর্ণ

রাখিয়া কোন কোন বিষয়ে তাহাদিগকে বঞ্চিতও রাখিয়াছেন। শচীন্দ্রের স্পর্শই রজনীর সমস্ত শরীরে তড়িৎশক্তি বহাইয়া দিয়া ধ্বনি-আকারে শ্রুতিগোচর হইয়াছে। ঐ স্পর্শই তাহার ইন্দ্রিয় মন প্রাণে সুখস্বর্গ সৃষ্টি করিয়া স্তবকে স্তবকে মন্দার কুসুম ফুটাইয়া তুলিয়াছে। দার্শনিক চিন্তার দিক্ দিয়া আমরা ত এইরূপ বুঝিয়া লইয়াছি।

শ্যামনটবর শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়াই শ্রীরাধা আপনহারা পাগল হইয়া শব্দ-লক্ষ্যে ছুটিয়া যায়। হংসমুখে নলরাজার রূপগুণের খ্যাতি শুনিয়াই দময়ন্তী তাঁহাকে মনে প্রাণে পতিত্বে বরণ করে। বাণসুতা ঊষা স্বপ্নে প্রদ্যুম্নতনয় অনিরুদ্ধকে দর্শনমাত্রই মুগ্ধা হইয়া পড়ে। আর রজনী শচীন্দ্রের স্পর্শ লাভ করিয়াই তাহাকে মনপ্রাণ অর্পণ করিয়া বসিবে, বিচিত্র কি ?

রজনী-চরিত্র সমালোচনা করিতে যাইয়া আমরা বুঝিতে পারিতেছি—ইহাতে সমালোচনা করিবার বিশেষ কিছু নাই। বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না—সেই-জাতির কুমারী নিজেই আপনাকে ফুটাইতেছে, ঘোমটা-আবরণ খুলিয়া ফেলিয়া নিজের মুখসৌন্দর্য্য আপনিই দর্শকের চক্ষুর উপর ধরিয়া দিতেছে ; কখনও আবার কবি ও দার্শনিকরূপে গভীর মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছে। আমরা আর কি ফুটাইব, কি দেখাইব, আর কি বা ব্যাখ্যা করিব ?

রজনী বলিতেছে—"শুষ্ক ভূমিতে বৃষ্টি পড়িলে কেন না সে উৎপাদিনী হইবে ? শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নি সংলগ্ন হইলে কেন না সে জ্বলিবে ?" রজনী এস্থলে আপনাকে শুষ্ক ভূমি ও শুষ্ক কাষ্ঠের সহিত তুলনা করিল। বুঝিতে পারা গেল, বয়োধর্ম্মে, মনে মনে

সে প্রেমরসপিপাসু হইয়াছে। তাপসকন্যা শকুন্তলা আর অন্ধ ফুলওয়ালী, ভালবাসার ক্ষেত্রে দুইই সমান। প্রকৃতির প্রভাব সর্ব্বত্রই অবারিত। রমণীহৃদয় সর্ব্বকালেই একরূপ। মদনের শর তপোবনেও প্রবেশ করে, অন্ধ ফুলওয়ালীর বক্ষেও বিঁধে, দ্বীপবাসিনী নির্জ্জনপালিতাকেও ছাড়ে না।

"রূপে হউক, শব্দে হউক, স্পর্শে হউক, শূন্য রমণী-হৃদয়ে সুপুরুষসংস্পর্শ হইলেও কেন প্রেম না জন্মিবে?" রজনী আপনার হৃদয়টি শূন্য বলিয়া ভাবিয়া আসিয়াছে এবং সেই শূন্যের পূর্ণতা-লাভই যে, জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি, এই দাবী সে করিতেছে। সাধে কি আর কবি, রজনীকে পঞ্চদশী, ষোড়শীর উপর একেবারে উনবিংশতি করিয়াছেন? স্পর্শে, গন্ধে এবং যৌবনের গোপন পরিচয়ে, আকাশের চন্দ্রবৎ দুষ্প্রাপ্য শচীন্দ্রকে সে একেবারে সুপুরুষ বলিয়া মনেপ্রাণে অভিনন্দিত করিয়া লইয়াছে। ইহা প্রগাঢ় যৌবনের তৃষ্ণা, নূতন অনুরাগের ফল।

রজনীর স্বাভাবিক কবিপ্রতিভা অবশ্যই ছিল—নতুবা পুষ্প লইয়া রাত্রিদিন নাড়াচাড়া করিতে করিতে কবিত্বটি পুষ্পকলিকার মত সহসা ফুটিবে কেন? পূর্ব্বরাগের ইন্দ্রজাল-সম্মোহে ওই কলিকাটি আবার সহসা শতদলের মত শত দলে পূর্ণ হইয়া বিকশিত হইয়া উঠিবে কেন? অন্ধ ফুলওয়ালী নারীর মুখে তাই আমরা শুনিলাম—"দেখ অন্ধকারে ফুল ফোটে, মেঘ ডাকিলেও চাঁদ গগনে বিহার করে, জনশূন্য অরণ্যেও কোকিল ডাকে, যে সাগরগর্ভে মনুষ্য কখন যাইবে না, সেখানেও রত্ন প্রভাসিত হয়।" (রত্ন প্রভাসিত হওয়ার কথা যেমন শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের কথা, চাঁদের

গগনে বিহার করার কথাও তেমনই শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের কথা) "অন্ধের হৃদয়েও প্রেম জন্মে, আমার নয়ন নিরুদ্ধ বলিয়া হৃদয় কেন প্রস্ফুটিত হইবে না ?"

আমরা শুনিয়াছি, বিলোলকটাক্ষবতী ভামিনীরা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন যে, কাণা ফুলওয়ালীর আবার প্রণয়, সে প্রণয়ের আবার অমন ব্যাখ্যা ? রজনী সে উত্তর আপনিই দিয়া রাখিয়া গিয়াছে—"অন্ধের হৃদয়েও প্রেম জন্মে।" * * *" সকল মানুষের ধমনীতেই রক্ত চলাচল করে, সকলের হৃদয়েই দয়া মায়াদি বৃত্তি থাকে, সকলের মধ্যে নারায়ণ অবস্থিতি করেন। চন্দ্রকিরণ সাগরেও খেলে, পল্বলেও পড়ে।

শুনিয়াছি প্রাচীনকালে গার্গী, মৈত্রেয়ী, সুলভা, শাণ্ডিলী, চূড়ালা ও লীলা প্রভৃতি রমণীরা দার্শনিকতত্ত্বের মীমাংসা করিতেন। ঋষিসংবাদে যাজ্ঞবল্ক্যের মত ঋষির সহিতও কেহ কেহ বিষম তর্ক আরম্ভ করিতেন। অন্ধ ফুলওয়ালীও দার্শনিক তত্ত্বের মীমাংসা না করিবে কেন ? "আমি জানি, রূপ, দ্রষ্টার মানসিক বিকারমাত্র, শব্দও মানসিক বিকার। রূপ রূপবানে নাই। রূপ দর্শকের মনে—নহিলে একজনকে দেখিয়া সকলেই আসক্ত হয় না কেন।"

রজনী গ্রন্থকারের মানসী কন্যা। অন্ধ, নিরাশ্রয়া বলিয়া কবির বড় আদরের পাত্রী। কবি স্বয়ং মহাকবি ও দার্শনিক, ইহাকে আপনার কবিত্ব ও দার্শনিক প্রতিভা দ্বারা গড়িয়া তুলিয়াছেন বলিয়াই কি রজনী কবি দার্শনিক হইয়াছে ?

রজনীর পূর্ব্বরাগটির সঞ্চার বড়ই মধুর। শচীন্দ্র যখন তাহার নারীজন্ম সার্থক করিয়া করদুটী ধরিল—তখন তার মনে হইল,

কে যেন প্রফুল্লদলগুলির দ্বারা তাহার প্রকোষ্ঠ বেড়িয়া ধরিল—কে যেন মালা গাঁথিয়া তাহার কর বেড়িয়া দিল। তখন প্রেমরসার্দ্রা তরুণীর এমনই ইচ্ছা হইতেছিল—"কেন সে জল হইয়া যায় নাই ?—শচীন্দ্র ও সে, দুইটী ফুল হইয়া এইরূপ সংস্থষ্ট হইয়া কোন বন্যবৃক্ষে গিয়া ফুটিয়া রহিল না ?"

রসে গলিয়া জল হইয়া যাওয়ার কল্পনা সাধারণ প্রেমিকার মুখে শোনা যায় না। ফুল লইয়া মালা গাঁথা যাহার নিত্য কার্য্য, ফুল হইয়া সংস্পৃষ্ট হওয়ার ইচ্ছা তাহার মনে জাগাই স্বাভাবিক। এই সংসারে, বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থায় রজনীর ভাগ্যে শচীন্দ্র-লাভের সম্ভাবনা নাই, তাই সে, নগর বা গ্রামের বাহিরে বন্যবৃক্ষে শচীন্দ্রের সহিত ফুল হইয়া ফুটিয়া থাকিতে চাহে। লোকের দৃষ্টির অগোচরে—যেস্থানে সামাজিক সম্ভ্রম, ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য নাই—সেই নির্জ্জন স্নিগ্ধবনচ্ছায়া-তলে বাস করিতে চাহে। আমি তাহাতে নয়ন হইয়া থাকিব, ফুল হইয়া সংস্পৃষ্ট রহিব, জল হইয়া রোমকূপের ভিতর দিয়া অস্থি মজ্জার মধ্যে প্রবেশ করিয়া মিশিয়া যাইব ;—প্রেমের এই তন্ময়তাই রজনী আকাঙ্ক্ষা করে।

* প্রিয়তম, জাগে সাধ,
বনে বনে বেড়াব দুজনে।
তুমি রবে আমাতে মিশায়ে,
আমি রব তোমাতে বিলীন।
থাকিবে না গৃহকার্য্য কোন,
রাণী ব'লে থাকিবে না কেহ।

* গ্রন্থকার-প্রণীত "শ্রীরামচরিত" নাটক হইতে।

একবার মাত্র স্পর্শে রজনী ভাবিল যে, সে শচীন্দ্রের স্ত্রী। এই পাণিস্পর্শকে সে পাণি-গ্রহণ ভাবিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, "ইহলোকে অন্ধ ফুলওয়ালীর আর কেহ স্বামী হইবে না।" এই "ইহলোকের" বলিবার তাৎপর্য্য—পরলোকের উপর আমার হাত নাই আর সে সম্বন্ধে জোর করা সাজে না, তবে ইহলোকে ইহাই আমার স্থির। লবঙ্গলতার "জন্মান্তর যদি থাকে", একথার অর্থ অন্যরূপ, ইহাতে জন্মান্তরে মিলনের আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে।

যুগে যুগে রমণীরা প্রণয়ীর প্রথম দর্শনমাত্র এইরূপই অনুরক্তা হইয়াছে ; প্রতিজ্ঞা করিয়াও বসিয়াছে—"ইহাকে বিনা কাহাকেও আর পতিত্বে বরণ করিব না।" দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা হইতে আরম্ভ করিয়া জগৎসিংহ ও তিলোত্তমাপ্রভৃতি অনেক প্রণয়ী প্রণয়িনীর পূর্ব্বরাগ এইপ্রকারই দেখা গিয়াছে। এই পূর্ব্বরাগের নাম চক্ষুরাগ বা তারামৈত্রক। রজনীর পূর্ব্বরাগে গন্ধ, স্পর্শ ও শ্রবণের সম্বন্ধ আছে—এজন্য তাহার এই পূর্ব্বরাগের নাম চক্ষুরাগ বা তারা-মৈত্রকও হইবে না ; অথচ ইহাকে স্পর্শরাগ, শ্রবণরাগ বা গন্ধরাগ নাম দিলেও আলঙ্কারিকগণ কখনও সম্মতি দিবেন না।

রজনী শচীন্দ্রচিন্তাতেই বিভোরা। শচীন্দ্র এবং বিমাতা লবঙ্গলতা একযোগে রজনীর অনূঢ় অবস্থার মোচনে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। রজনী আপত্তি করিল, কাঁদিল। কিন্তু তবু সে, শচীন্দ্রকে ভালবাসিয়াছে—ইহা বলিতে পারিল না। হায়, অন্ধের মর্ম্মব্যথা কেহ বুঝিল না। তখন পূর্ণযৌবনা অন্ধ নারী, প্রতিবেশিনী চাঁপার প্ররোচনায়, রাত্রি দ্বিপ্রহরে, একবস্ত্রেই গৃহের বাহির হইয়া পড়িল। রজনী যদি ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী এমন কি

ষোড়শীও হইত, তাহা হইলে এ অসম ভরসা হয়ত সে করিতে পারিত না। আইনমতে সে সাবালিকা; কাব্যের ভাষায়, গাঢ় যৌবনা। অন্ধ বলিয়াই রজনী রাত্রি দ্বিপ্রহরের ভয় (অন্ধের কিবা রাত্রি, কিবা দিন?) করিল না। অন্ধ বলিয়াই চাঁপার মুখে ক্রূর কুটিলতার হিংস্র দীপ্তি দেখিতে পাইল না। প্রেমের মোহে অন্ধ, আবেগে উন্মত্ত হইয়া, বিবাহ বন্ধ করার জন্যই সে বিপৎ-সাগরে ঝাঁপ দিয়া বসিল।

সূর্য্যমুখী, কুন্দ, মৃণালিনী, শ্রী, প্রফুল্ল আর রজনী সকলেই (যে-কারণেই হউক) একাকিনী বাটীর বাহির হইয়াছে, অথচ তাহা কুলত্যাগ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। (মৃণালিনী মনে মনে ভাবিয়াই লইয়াছিল যে, পিতামাতার গৃহে তাহার ফিরিবার পথ বন্ধ)। ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ, তিনি মনোভাব লইয়াই বিচার করিতে পারেন, আর কাব্য নাটক বা উপন্যাসে "নিরঙ্কুশা কবয়ঃ" লেখকেরা মনোভাব লক্ষ্য করিয়া—যেস্থানে লক্ষ্য চলে না সেখানে কল্পনা করিয়া—ঐ মনোভাবের অনুরূপও বিচার করিয়া থাকেন। (আর আজিকালি ত মনোভাবই নষ্ট হউক অথবা জড়দেহই কলুষিত হউক, তাহাতে বিচারের পার্থক্য হয় না)। সাধারণ নরনারীর পক্ষে মনোভাব লক্ষ্য করিয়া বিচার করা ত একপ্রকার অসম্ভব বলিলেই হয়।

সমাজের বিচার বা ব্যবস্থা অন্যরূপই হইয়া থাকে। গভীর রাত্রে পরপুরুষের সহিত যুবতী নারীর একাকিনী প্রস্থান বা পলায়ন, সমাজ ভাল চক্ষুতে দেখিতে পারে না। ইহার মধ্যে ভাল মনোভাব কদাচিৎ সম্ভব হইলেও সচরাচর সম্ভব হয় না

বলিয়া বহুলোকাধ্যুষিত সমাজ মন্দভাবই ধরিয়া লইয়া থাকে। সাধারণ ব্যক্তিকে বাহিরের কার্য্য দেখিয়াই বিচার করিতে হয়। ধর্ম্মাধিকরণে সাক্ষ্য-দৃষ্টেই বিচার হইয়া থাকে।

বিশ্বের নারীরা জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া, প্রতিহিংসায় অন্ধ হইয়া বা কামমোহে উন্মত্ত হইয়া গৃহত্যাগ করে। ত্যাগ বুদ্ধিতে, পরোপচিকীর্ষাবশে কিম্বা কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মভাবের প্রেরণায়, গৃহত্যাগ অতি অল্প নারীরাই করিয়া থাকে। রজনী কঠোর কর্ত্তব্য এবং ধর্ম্ম-প্রেরণাতেই অবশ্য গৃহত্যাগ করিয়াছে—এইজন্য তাহার দোষ দেওয়া একেবারেই চলে না।

রজনীর ধর্ম্মভাব, সতীত্ব তেজ, এবং সময়োচিত সাহস অতুলনীয়। সে যে চাঁপার ভ্রাতা পাপিষ্ঠ হীরালালের পাপ-প্রস্তাবে সম্মতা হয় নাই—ইহা ধর্ম্মভাবের নিদর্শন। প্রাণত্যাগ অবধারিত জানিয়াও, সে যে আপনার প্রতিজ্ঞায় স্থির রহে—ইহা ধর্ম্মভাবময় সতীত্ব-তেজের নিদর্শন। রাত্রিকালে গলাজলের মধ্যে অন্ধ নারী যে, শব্দের স্থানানুভব করিয়া পাপিষ্ঠের মস্তক লক্ষ্যে সবলে লাঠি ছুড়িয়া মারে—ইহা অতুল সাহসের পরিচায়ক। গঙ্গাজলপ্রবাহমধ্যে নিমগ্ন হইয়া ভাসিতে ভাসিতে রজনীর ক্রমে শ্বাস নিশ্চেষ্ট, চেতনা বিনষ্ট হইয়া আসিল।

রাখে কৃষ্ণ, মারে কে?—অমরনাথ জলমগ্না মুমূর্ষুকে উদ্ধার করিয়া তাহাকে বাঁচাইল। শুধু বাঁচাইল তাহা নহে, অনেক যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া তাহার নষ্ট সম্পত্তির উদ্ধার করিয়া দিল।

রজনীর স্বার্থত্যাগ এবং তন্মূলক আত্মদানই তাহাকে দেবীত্বে পরিণত করিয়াছে। অন্যাসক্তা হইয়াও রজনী, জীবনদান এবং

নষ্টসম্পত্তির উদ্ধারের কৃতজ্ঞতাস্বরূপে জীবনদাতার চরণতলে আপনাকে উৎসর্গ করিতে চাহিল। জীবনদাতা (অমরনাথ) রজনীকে বিবাহ করিতে চাহিতেছে বলিয়াই সে, বিবাহে মত দিল। এস্থলে রজনী নিজের লাভালাভ, সুখ দুঃখ, এমন কি ব্যক্তিত্বটুকু বিসর্জ্জন দিয়াও জীবনদাতা অমরনাথের দাসীত্বের উপযুক্তা করিয়া আপনাকে গড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

সন্ন্যাসীর অলৌকিক মন্ত্রগুণে শচীন্দ্র স্বপ্নে রজনীকে দেখিল। প্রগাঢ় অনুরাগের পরিচয় পাইয়াই শচীন্দ্র তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিল। এস্থলে রজনীর প্রগাঢ় অনুরাগই অলক্ষ্যে শচীন্দ্রকে আকর্ষণ করিল। সন্ন্যাসীর মন্ত্রগুণ উপলক্ষ্য মাত্র।

রজনী মনে প্রাণে অবশ্যই শচীন্দ্রকে চাহিতেছিল, কিন্তু যখন সে, লবঙ্গলতার মুখে আশ্বাস পাইল, শচীন্দ্রের সঙ্গে আমি তোমার বিবাহ দিব।" তখন সেই রজনী—"শচীন্দ্রের জন্য রাত্রে গৃহত্যাগ-কারিণী সে-ই রজনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিল, "দিতে পারিবেন না, অমরনাথ হইতে আমার সর্ব্বস্ব। অমরনাথ আমার বিষয় উদ্ধারের জন্য যাহা করিয়াছেন, পরের জন্য পরে কি তাহা করে? তাও ধরি না, তিনি আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। * * যাহার কাছে আমি এত ঋণী, তিনি আমায় যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। তিনি যখন অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে দাসী করিতে চাহিয়া-ছেন, তখন আমি তাঁহারই দাসী হইব, আর কাহারও নহে।"

রজনীর এ আত্মবলি। সাধারণ মানবীতে ইহা দুর্লভ। শচীন্দ্র-লাভ তখন আর আকাশকুসুম নহে, একপ্রকার করতল-গত বলিলেই হয়। তথাপি সে শচীন্দ্রকে না চাহিয়া আপনার

নারীজীবন ব্যর্থ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইল না। এমন কি, আপনার দুর্ব্বলতা-দোষ—যাহা রমণীর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা লজ্জার কথা—তাহাও, পতিরূপে স্থিরীকৃত জীবনদেবতা অমরনাথকে বলিতে দ্বিধা করিল না। শচীন্দ্রকে সে ভালবাসিয়াছিল, এখনও বাসে, ইহা জানিলে অমরনাথ তাহাকে বিবাহ না করিতে পারে —এই আশা করিয়া সে অমরনাথকে পরিচয় দিতে যায় নাই। দেবতাকে লুকাইয়া বা না জানাইয়া অন্যাসক্ত প্রাণটি পুষ্পাঞ্জলি-রূপে দান করিয়া আপনাকে সে অপরাধিনী করিতে চাহে না। সমস্ত জানিয়া শুনিয়া দেবতা যদি তাহাকে দাসীত্বে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে রজনীর আর আপত্তি করিবার কিছু থাকে না; তাই সে, অমরনাথের নিকট সমস্ত প্রকাশ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

রজনী শচীন্দ্রানুরাগিণী; লবঙ্গলতার চক্ষুতে অশ্রু, অমরনাথের আর বিবাহে রুচি রহিল না। শচীন্দ্রের সহিত রজনীর বিবাহ দেওয়া সাব্যস্ত করিয়া অমরনাথ, যে ভবঘুরে, সেই ভবঘুরে হইয়া রহিল। এই বিবাহ লবঙ্গলতার প্রার্থনীয় (বিষয় সম্পত্তির জন্য শেষে শচীন্দ্রের জন্য)। এ বিবাহে ক্ষতি কিন্তু তাহারই হইল। সর্ব্বতোনিরুদ্ধ তাহার পূর্ব্ব অনুরাগ নিরুদ্ধ বায়ুর মত তাহাকে মর্ম্মপীড়িতা করিতে লাগিল। একদিন বালসুলভ চাপল্যবশে পরের পৃষ্ঠে তপ্ত লৌহ চিহ্নিত করিয়া দিয়াছিল, আর বয়সকালে সেই তপ্ত লৌহের জ্বালাই আজ সে নিজেরই বক্ষের মধ্যে শতগুণ অনুভব করিল। এ ক্ষতি রমণীর বড় বিষম ক্ষতি।

ঔষধের অত্যাশ্চর্য্যগুণে রজনীর অন্ধতা সারিয়া গেল। ভাস্কর-

গঠিতা প্রস্তরমূর্ত্তির মত সেই রজনী এখন বিলোলকটাক্ষকুশলিনী হইয়া উঠিল। লজ্জাও অমনই কোথা হইতে আসিয়া সেই নব উদ্ভিন্ন চক্ষুর উপর তার কোমলরাগটুকু মাখাইয়া দিয়া গেল। বক্র কটাক্ষও আচম্বিতে আসিয়া অপাঙ্গের কোণে আত্মপ্রকাশ করিল।

রজনী এখন স্থির, গম্ভীর ও ঈষৎসঙ্কুচিত মূর্ত্তি লইয়া দুঃস্বপ্ন-গঠিতার মত ধীরে ধীরে পদক্ষেপ করে না। সে এখন মহিম-যুতা জ্যোতির্ম্ময়ী আকৃতি ধরিয়া প্রেমদেবীর মত কখন ধীর, কখন দ্রুত, কখন বা অধীর চপল-গতিতে ঘুরিয়া বেড়ায়। কবির ভাষায় সে এখন স্থির, সজীব বিদ্যুল্লতা।

অমরনাথ রজনীকে শচীন্দ্রকরে অর্পণ না করিলে এ বিবাহ হইতে পারিত না। রজনী ত একপ্রকার অমরনাথেরই দান। এজন্য, কি শচীন্দ্র, কি রজনী, উভয়েই অমরনাথের প্রতি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আজীবন বদ্ধ ছিল। তাহাদের প্রথম সন্তানটির "অমরপ্রসাদ" নামকরণ হইতেই এই কৃতজ্ঞতার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। অমরনাথ, লবঙ্গলতা ও শচীন্দ্র, সকলেই এক এক দিকে অল্পবিস্তর স্বার্থত্যাগ করিয়া গিয়াছে। কিন্তু রজনী, অনেক ক্ষেত্রে যে অতুলনীয় স্বার্থত্যাগের বা আত্মত্যাগের মহিমা প্রদর্শন করিয়াছে, তাহার তুলনা দুর্লভ। সম্পত্তিলাভ, শচীন্দ্র-প্রাপ্তি এবং অন্ধত্বমোচনকে আমরা রজনীর প্রেম এবং আত্মত্যাগেরই পুরস্কার বলিয়া মনে করি।

শৈবলিনী ও প্রতাপ।

অমরকবি বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর" গ্রন্থের নায়িকা শৈবলিনীর নামকরণটী বড়ই সার্থক। চরিত্রের গুণাগুণ, জীবনের মূল সূত্র এবং ভবিষ্যদ্-ঘটনার প্রাণপঞ্জীর সন্ধান যে নামের মধ্যে পাওয়া যায়, সেই নামই প্রকৃত নাম। যাহাকে যে নামেই ডাকা হউক না কেন, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, ইহা আমরা বলি না। গোলাপের নাম অঘোর-ঝিন্টিক, হইলে মানায় না। শৈবলিনীর নামও রমা বা কপালকুণ্ডলা রাখিলে ভাল শুনায় না। মন্ত্রের শক্তি আমরা মানি, নামকে ভগবানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আসন দিই, তজ্জন্য—নামকে মাত্র বাহিরের আবরণ বলিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি না। শৈবলিনী অর্থে নদী। নদী শৈলাশখর হইতে জন্ম লইয়া নাচিতে নাচিতে সমতল ভূমিতে উপনীত হয়। কোথায়ও লঘুচপল, কোথায়ও ধীরগম্ভীর গতিতে বহিয়া চলে; ইহাই নদীর শৈশবকাল। শৈবলিনীও গৌরব-শৃঙ্গে সমাসীন অমর কবির মানসী দুহিতা। পল্লীর ছায়া-স্নিগ্ধ তরুতলে স্বর্ণময়ী লতাটির মত আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কখন মুক্ত হরিণীর মত উল্লসিত গতিতে ছুটিয়া চলে, কখন বদ্ধ ময়ূরীর ন্যায় পেখম তুলিয়া আকাশের পানে চাহিয়া রহে। নদী মধ্যপথে আসিয়া ক্রমশঃ আকারে বাড়িয়া যায়, খরস্রোতা ও আবিলা হইয়া উঠে। শৈবলিনীও যৌবনে পরিপূর্ণতায় উচ্ছল, দুর্দ্দম সাহসে অপরাজেয়, কাম-মোহের তৃষায়

আকুলা এবং পাপ-সংস্পর্শে পঙ্কিলা হইয়াছে। রূপতরঙ্গ শৈবলিনীর যৌবন-উৎফুল্ল বরবপুর দুইকূল ছাপাইয়া খরবেগে প্রবাহিত। তাহার গতি, নদী-স্রোতের মতই তালে তালে চলে। কটাক্ষ, সফরীর নৃত্যের মতই থাকিয়া থাকিয়া ছুটে। হাসিটি, তরঙ্গের উপর সংমুর্চ্ছিত চন্দ্রকর-রশ্মির মত রহিয়া রহিয়া ফুটে। "শৈবলিনী" শৈবলিনী অর্থাৎ নদীর মতই রহস্যময়ী। কখন কোন্ পথে যাইবে, তাহা সে জানে না। আদৌ বুঝে না, জীবনের ভেলা বাতাসের বেগে কোন্ স্রোতের টানে কোথায় গিয়া উঠিবে। স্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া দিয়া অবশের মত সে ভাসিয়াই চলিয়াছে।

ভাগীরথী-তীরে কোন গণ্ডগ্রামে ব্রাহ্মণকুলে শৈবলিনীর জন্ম। যে রত্ন কুবের-ভাণ্ডারে থাকিলে মানাইত, দরিদ্রের গোময়-লিপ্ত অঙ্গনে তাহার স্থান হইল। যে কুসুম ধনীর প্রমোদ-উদ্যানে ফুটিলে শোভা পাইত, পল্লীর ছায়াবহুল বনের ধারে তাহা ফুটিয়া উঠিল। বিলাসীর কণ্ঠহার এবং যৌবনের পুষ্পিতা লতা অর্দ্ধবয়স্ক দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় পাইল।

শৈবলিনী দরিদ্রের কন্যা। সংসারে বিধবা মাতা ব্যতীত আপনার বলিতে কেহ ছিল না। দরিদ্রের আত্মীয় থাকিয়াও নাই। রূপসৌন্দর্য্যে রাজ্ঞীর মত মহীয়সী বালিকা অনাদরের মধ্যে মানুষ হইয়া উঠিল। সুখ বা তৃপ্তি, কাহাকে বলে জানিল না। দরিদ্র বলিয়াই লেখাপড়া শিক্ষা তার হইল না। অবশ্য এখনকার দিনে হইলে শিক্ষার সুযোগ মিলিলেও মিলিতে পারিত। তবে শৈবলিনী যেরূপ বুদ্ধিমতী, শিখাইলে সে ভালই শিখিতে পারিত।

আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি—শৈবলিনী যখন পল্লীপথে ছুটিয়া

বেড়াইত, পথিকেরা সঞ্চারিনী হিরণ্ময়ী মূর্ত্তি ভাবিয়া বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া থাকিত। জলন্ত বহ্নিশিখারূপা তাহার পানে চাহিয়া পল্লীর বৃদ্ধেরা সজীব বিদ্যুচ্ছটা বলিয়া তাহাকে উপহাস করিত! কল্পনায় আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, শৈবলিনী সদ্য স্নান সারিয়া আপাদ-চুম্বিত কেশভার মার্জ্জনা করিতে করিতে তীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আর নৌকারূঢ় অপরিচিত ব্যক্তিগণ জলদেবী মনে করিয়া বিস্ময়-বিহ্বল হইয়া গিয়াছে।

শৈবলিনীর যে প্রকৃতিগত বিশিষ্টতা তাহাকে "শৈবলিনী" করিয়াছে, শৈশবেই তাহার বীজটি ফুটিতে দেখা যায়। সে বিশিষ্টতার মধ্যে কতকটা গর্ব্ব, স্বার্থপরতা, আত্মম্ভরিতা ও অদম্য ইচ্ছাশক্তির ভাব মিশ্রিত আছে। গণনা করিতে পারুক বা নাই পারুক. তবু সে গণনার ত্রুটি স্বীকার করিত না। হার মানিয়া লওয়া তাহার প্রকৃতিতে কখনই সম্ভব ছিল না। নতুবা, সে কি কখনও রূপসী-রূপে আপনার পরিচয় দিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিত,—না, পাগলিনী সাজিয়া ইংরাজের নৌকা হইতে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাতার দিয়া পলাইতে পারিত?

শৈবলিনী একজনের সহিত খেলা করিত, বেড়াইয়া বেড়াইত, নদীতীরে বসিয়া গঙ্গার ঊর্ম্মিমালার পানে চাহিয়া গল্প করিত—তাহারই নাম প্রতাপ।

কবি যে সময়ের চিত্র আমাদিগকে দেখান নাই, কল্পনার চক্ষুতে তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি। শৈবলিনী যখন অতি-শিশু, তখন সে প্রতাপের কোলে চড়িয়া যাইত। একটু বড় হইয়া চলিতে ফিরিতে শিখিয়াই দাদা, দাদা, বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত

আর বড় হইয়া ত তাঁহার কাছে কাছেই থাকিত। এক বংশে জন্ম, একস্থানে বসবাস, দুইজনের মধ্যে বড় ভাব। পরিণামে এই বাল্য-প্রণয় যখন গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল, তখন শৈবলিনী ভাবিত—"একবৃন্তে দুইটি ফুলের মত আমরা ফুটিয়া আছি।" উত্তরকালে চন্দ্রশেখরকে ইহা নিজমুখেই সে বলিয়াছিল।

আমরা যখন প্রতাপ ও শৈবলিনীকে প্রথম প্রত্যক্ষ করিলাম, তখন প্রতাপের বয়স পনের কি ষোল বৎসর। শৈবলিনীর বয়স সাত কি আট বৎসর মাত্র। প্রতাপ কিশোর, শৈবলিনী বালিকা। বালিকার বাল্য প্রেম যৌবনে প্রবল অনুরাগরূপে কখন কখন ফুটিয়া উঠে। দৃষ্টান্ত—এই শৈবলিনী।

দুইজনের এই ভাব, এই মেলা মেশায় আপনার জন বলিয়া ইহাতে কেহ কিছুই মনে করিত না। ভাই ভগিনীর এইরূপ ভাবটী যে পরে গাঢ় প্রেমে পরিণত হইতে পারে—ইহা কাহারও মনে আইসে নাই। শৈবলিনী যে উত্তরকালে আপনাদের পুত্র-কন্যার সম্বন্ধে এ বিষয়ে খরদৃষ্টি রাখিয়াছিল, ইহা আমরা অবশ্যই ধরিয়া লইতে পারি।

শৈবলিনী বালিকা, সেই বয়সেই সে বন-ফুলে মালা গাঁথিত, প্রতাপের কণ্ঠে ঐ মালা পরাইয়া বড় আমোদ পাইত। মালা পরাইবার সময়ে ইহা যে তাহার বরকেই পরাইতেছে, এজ্ঞান বালিকা হইলেও তাহার বেশ ছিল। এজন্য মালা পরাইয়াই ছুটিয়া পলাইত। প্রতাপের নিকট ইচ্ছা করিয়া কখনও আবার ধরাও দিত। স্বেচ্ছা-বন্দিনীত্বের সুখে আরামবোধও করিত।

ভাগীরথীর তীরে দূর্ব্বাসনে প্রতাপের ক্রোড়ে অর্দ্ধশায়িতা

বালিকা একমনে প্রতাপের মুখপানে চাহিয়া থাকিত, উৎকর্ণ হইয়া চাহিয়া থাকিয়া গল্প শুনিত, আর আকাশে কতগুলি তারা উঠিয়াছ, তাহার গণনা জুড়িয়া দিত। মৌন ক্রমশূন্য আলাপের মধ্য দিয়া সন্ধ্যা যে কখন পলাইয়া যাইত, তাহা তাহাদের উদ্বোধেই আসিত না। প্রতাপ জানিল যে, শৈবলিনী তাহার জ্ঞাতিকন্যা, কাজেই এ বিবাহ তাহাদের হইবার নহে—ইহা জানিয়া শুনিয়াও অবিমৃষ্যকারিতা, অপরিণামদর্শিতা এবং দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণের জন্য শৈবলিনীর সহিত না মিশিয়া পারিত না। প্রাণের আবেগ দমন করা উচিত, নচেৎ উভয়েরই অমঙ্গল, ইহা সম্যক্ বুঝিয়াও তথাপি প্রতাপ শৈবলিনীর সহিত মেলামেশা ত্যাগ করিল না। প্রথমেই ভালবাসার এই বীজটি যদি নাশ করা হইত, তাহা হইলে পরিণামে শতশাখা-প্রশাখাসমন্বিত মহান্ বনস্পতিরূপে ইহা দৃষ্ট হইত না। শৈবলিনী অতশত বুঝিত না, বুঝিবার মত তার বয়সও হয় নাই। উভয়ের বিভিন্ন জীবন-তরী দুইটী যে, কখনও এক হইয়া সাগরাভিমুখে বহিয়া চলিবেনা, তাহারই সূচনা দেখা গেল। শৈবলিনী কৈশোর ও যৌবন-স্থলে আসিয়া জানিল— প্রতাপ তাহার হইবার নহে। দেহের পরিপূর্ণতা, সৌন্দর্য্যের মনোহারিতা এবং যৌবনের অনবদ্য মাদকতার সঙ্গে সঙ্গে শৈবলিনীর ভালবাসাও পুষ্ট এবং বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। শৈবলিনীর বাসনার ভেলা অকুল মহানদীতে আসিয়া পড়িয়াছে, "বনরাজি-নীলা" ভূমি দেখা যাইতেছে না। ভবিষ্যসুখের দিঙ্মণ্ডল গাঢ় আঁধারে ছাইয়া গিয়াছে।

তখন দুইজনে অনেক দিন ধরিয়া গোপনে পরামর্শ আঁটিল।

বাল্যপ্রণয়ের সঙ্গে যৌবনের আকাঙ্ক্ষা ও তৃষ্ণার যোগ হওয়ায় এখন গোপনে দেখাশুনা আরম্ভ হইয়াছে। তখন দুইজনে একদিন গঙ্গাস্নানে গেল। প্রতাপ যুবক, শৈবলিনী কিশোরী, নবযুবতী। তীরস্থ নরনারীর কৌতুক-বিস্ফারিত চক্ষুর উপর অনেকে সাঁতার দিল। প্রতাপ ও শৈবলিনী সাঁতার দিয়া গভীর জলে চলিয়া গেল। ভাগীরথীর উচ্ছল জলরাশির সহিত নাচিয়া নাচিয়া দুলিয়া দুলিয়া দুইটী ফুলের মত দুইজনে স্রোতের সঙ্গে পাশাপাশি ভাসিয়া চলিল। প্রতাপ বলিল "শৈবলিনী, শৈ—এই আমাদের বিয়ে!"

শৈবলিনী বলিল "আর কেন—এইখানেই" ; বুঝা গেল, ব্যর্থ জীবনের প্রেম-নৈরাশ্যের এই ঔষধ সেবনই তাহারা গোপনে স্থির করিয়াছিল। প্রতাপ ডুবিল, শৈবলিনী ডুবিলনা। শৈবলিনীর বড় ভয়, সে মনে ভাবিল "আমি কেন মরিব? প্রতাপ আমার কে? আমার ভয় করে, আমি মরিতে পারিব না।"

শৈবলিনীর প্রেমে ত্যাগভাব নাই। এ প্রেম স্বার্থপরতাপূর্ণ ও সকাম, শৈবলিনী ডুবিল না, ফিরিয়া গেল। ভবিষ্যতে শৈবলিনীর জীবনস্রোতও যে ফিরিবে, তাহার প্রণয়-নদী যে প্রতাপের বিপরীত পথে চলিবে—তাহার সূচনা দেখা গেল।

চন্দ্রশেখর নৌকায় থাকিয়া ইহাদের সাতার দেওয়া লক্ষ্য করিতেছিলেন। জলমগ্ন প্রতাপকে উদ্ধার করিয়া ঔষধ ও প্রক্রিয়াগুণে তিনি তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিলেন। তারপর,—বিবাহ করিবেন না, শাস্ত্র আলোচনাতেই জীবন কাটাইবেন স্থির করিয়াও

অৰ্দ্ধবয়স্ক জ্ঞানবান্ পণ্ডিত শৈবলিনীর রূপসৌন্দর্য্যের আকর্ষণে তাহাকে বিবাহ করিয়া ফেলিলেন।

শৈবলিনী আপত্তি করিল না। প্রতাপের নিকট সে আর কোন্ লজ্জায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে? যাহাকে পাইবার নহে, তাহার জন্য কেন সে জীবন ব্যর্থ করিবে? এক্ষেত্রেও মনে মনে সে ভাবিয়া থাকিবে "প্রতাপ তাহার কে?" তাহার জন্য কেন সে জীবন ব্যর্থ করিবে? প্রতাপ ও শৈবলিনী উভয়ে উভয়কে ভালবাসিত বটে, কিন্তু তথাপি দুইজনের ভালবাসার মধ্যে একটি প্রকৃতিগত পার্থক্য ছিল—যে জন্য প্রতাপ ডুবিল, শৈবলিনী ডুবিল না।

প্রতাপের প্রেম আত্মবিসর্জ্জনের আকাজ্ক্ষা, শৈবলিনীর প্রেম ভোগেচ্ছার চরিতার্থতা। একের নিষ্কাম, অপরের সকাম। প্রতাপ প্রেমিক আত্মজয়ী; শৈবলিনী প্রেমপীড়িতা ভোগপ্রিয়া। প্রতাপ চিত্তবলে শারীরিক দৃঢ়তায় উন্নতশির হিমাদ্রি। শৈবলিনী আকাজ্ক্ষা-পরবশতাহেতু দুর্ব্বলতায় স্রোতোবশগা নতমুখী বেত্রলতা। প্রতাপ বলী, তাই সে চিত্তজয়ী। শৈবলিনী অধীরা ক্ষুদ্রনদী, তাই সে চিত্ত-বেগরূপ স্রোতের টানে বহমানা। প্রতাপের প্রেম স্বর্গের অমৃত, ত্যাগের যজ্ঞীয় হবিঃ—তাই প্রতাপ আপনার বলে স্বর্গের অধিকারী হইল। শৈবলিনীর প্রেম মর্ত্ত্যের বারি, ভোগের তীব্র সুরা,—তাই শৈবলিনী আকাজ্ক্ষার জ্বালায় জ্বলিয়া ইহজীবনেই নরক-ভোগ করিল। অবশ্য পরে মহাপুরুষের কৃপায়, চন্দ্রশেখরের ক্ষমার মাহাত্ম্যে, আশ্চর্য্য উপায়েই তাহার পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছিল। কামমোহের খাদটী অগ্নিতাপে গলিয়া যাইলেই স্বর্ণের ভাস্বর রূপ ফুটিয়া উঠে।

প্রতাপ আপনার প্রগাঢ় প্রেম হৃদয়ের নিভৃত গুহায় নিরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ঐ প্রেম বাহিরে প্রকাশ না পাইলেও তুষাগ্নির মত তাহার মর্ম্মস্থলে সর্ব্বক্ষণেই ধিকি ধিকি জ্বলিত। সংযমের গুণে বাহিরেই প্রশান্ত সাগরের মত ইহা স্থির, কিন্তু অভ্যন্তরে বাড়বাগ্নি নিয়তই প্রজ্জ্বলিত ছিল। জীবিতকালে অবশ্য কেহই তাহা জানিতে পারে নাই। মৃত্যুকালে রামানন্দ স্বামীর "তুমি কি শৈবলিনীকে ভাল বাসিতে?"—এই প্রশ্নে সেই অগ্নিরই স্ফুলিঙ্গবিকাশ দেখা গিয়াছিল।

প্রতাপ শৈবলিনীকে আত্মসমর্পণে উৎসুক জানিয়াও আত্মসংবরণ করিল; শপথপাশে বদ্ধ করিয়া তাহাকে উদ্ধারের পথে আনিয়া ফেলিল। শৈবলিনী কামমোহের প্রেরণায় লজ্জাহীনা কামুকীর মত প্রেম যাচ্ঞা করিল, তারপর প্রতাপকে সাক্ষাৎ করিতে নিষেধ করিয়া তাহার মৃত্যুর কারণ হইল। প্রতাপ আবাল্যপোষিত ভালবাসার হোমাগ্নিতে কামকলুষ দেহ আহুতি দিয়া অমরত্ব লাভ করিল। শৈবলিনী চিরপোষিত ভোগতৃষ্ণার বিষে জর জর হইয়া দিগ্বিদিকে ছুটিতে ছুটিতে স্থূলদেহে নরক এবং উন্মাদরোগ ভোগ করিল।

প্রতাপ প্রকৃতই সংযমী মহাবীর। দুর্দ্দান্ত অন্তঃশত্রুকে জয় করায় তাহার বীরত্ব পরিস্ফুট। প্রতাপ সংযমে ব্রাহ্মণ, বীরত্বে ক্ষত্রিয়, অধ্যবসায়ে বৈশ্য এবং পরিচর্য্যায় শূদ্র। আকাঙ্ক্ষাদমনে তাহার দেবত্ব, অন্যানুরাগপোষণে তাহার মানবত্ব। স্থৈর্য্যে হিমাদ্রি, ধৈর্য্যে ভূমণ্ডল এবং গভীরতায় মহাসাগর।

প্রতাপ গুরু-আজ্ঞায়, কর্ত্তব্যবোধে, ভুলিবার আশায় এবং

শৈবলিনী যদি তাহাকে ভূলে এই প্রত্যাশায় বিবাহও করিয়াছিল। সংসারসুখের আশায় সে বিবাহ করে নাই। প্রতাপের স্ত্রী "রূপসী", নামেই রূপসী ছিল, প্রেমের চক্ষুতে সে রূপসী ছিল না, আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতীও ছিল না। রূপসী তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী স্ত্রী হইলে অবশ্য প্রতাপেরও চলিত না। প্রতাপের হৃদয়তল লক্ষ্য করিতে পারে—এমত বুদ্ধিমতী স্ত্রীর সঙ্গে তাহার বনিবনাও হইত না। রূপসী হৃদয়ের দিক্ দিয়া প্রতাপের উপেক্ষিতা নারী। বাণভট্টের পত্রলেখার মত ইহাকেও কবির উপেক্ষিতা বলা চলে। কবি রূপসীর চিত্রটি একবার মাত্র আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। শৈবলিনীর উপর সুন্দরীকে গালিগালাজ করিতে শুনিয়া রূপসী বলিয়াছিল "দিদি, তুই বড় কুঁদুলে।" এই একবার মাত্র তাহার মুখ খোলাতেই বুঝিতে পারা গেল—রূপসী সরলা, হৃদয়রহস্যে ব্যুৎপন্ন-বর্জ্জিতা এবং উদারপ্রকৃতি রমণী।

শৈবলিনী প্রতাপকে পাইল না বা প্রতাপের মত রূপবান্ কোন প্রেমিক যুবককেও পতিরূপে পাইল না। পতিরূপে পাইল শাস্ত্রচিন্তারত, অপ্রেমিক এক অধ্যাপক ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে। শাস্ত্র-পাঠ, জপতপ এবং গণনাই যাঁহার সর্ব্বস্ব, যুবতী নারীর—তথা শৈবলিনীর স্থান তাহাতে কোথায়? ভাবে কলকল, আবেগে ছলছল, কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ এ প্রণয়স্রোত কোন উপযুক্ত খাত না পাইয়া শৈবলিনীরই চারিদিক্ ঘিরিয়া উছলিয়া পড়িতে লাগিল। অভাগী তখন আপনার দিকে চাহিয়া ব্যর্থ যৌবনের ভারে আপনার রূপ এবং যৌবনকে ধিক্কার দিতে থাকিল।

বলা বাহুল্য, চন্দ্রশেখরের পতিত্ব তাহার ভাল লাগিবে কেন?

মনের সাধ আহ্লাদ পূর্ণ ত হইলই না, জীবনের আকাঙ্ক্ষা আর যৌবনের তৃষ্ণা তাহার একদিনের তরেও মিটিল না। একে যুবতী-হৃদয় অন্যাসক্ত হইয়াছে তাহার উপর এ অবহেলায় (বাহ্যতঃ) পতির ঔদাসীন্য ও উপেক্ষা বাড়িয়াই চলিয়াছে, কাজেই শৈবলিনীর অন্তরের অগ্নি নিভিবে কি—আরও জ্বলিয়া উঠিল। তখন অভাগী হৃদয়ের মধ্যে নরক পুষিয়া রাখিয়া বাহিরে গৃহলক্ষ্মী সাজিয়া রহিল। যন্ত্রচালিত পুত্তলির মত সে ঘুরিত ফিরিত মাত্র; শাসনপিষ্ট বঙ্গবধুর মত গৃহকার্য্য করিয়া যাইত মাত্র। যৌবনের মুকুলিত অনুরাগ নৈরাশ্যের অনলে ভস্ম হইয়া গেল। যুবতীর মনের ক্ষুধা বা প্রাণের তৃষ্ণা মিটিল না। বিবাহের মন্ত্রও অন্যাসক্তিরুদ্ধ শৈবলিনীর কর্ণের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিল না।

শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের গৃহে আসিয়া অধিক দিন বাস করে নাই, সতী লক্ষ্মীর গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া চন্দ্রশেখরকে অধিক দিন বুঝিবারও চেষ্টা করে নাই। সংযমী ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত পতির গৃহিণীকে বাধ্য হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেই বাহ্যসংযমে অভ্যস্তা হইতে হইয়াছিল, কিন্তু তাহার ফলে ভিতরের অসংযম শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। যৌবনের তৃষ্ণাবিষে আপাদমস্তক অনুরঞ্জিতা—অভাগীর জন্য দুঃখ হয়, সহানুভূতিও জাগে। কোথায় তাহার দিনগুলি আদরে সোহাগে এবং দৈনন্দিন মান অভিমানে কাটিয়া যাইবে, তাহা হইল না। "সারারাত্রি কাটিবে হরষে, প্রহর হবে না অববোধ," যৌবনের এ স্বপ্ন তাহার কাছে স্বপ্নই হইয়া রহিল। অলক্তকরঞ্জিত চরণ দুইখানির নূপুর-শিঞ্জন গৃহপ্রাঙ্গণে

একদিনও শোনা গেল না; অধরোষ্ঠ তাম্বুলরাগে অরুণ হইয়া একদিনও হাসির শ্বেতিমায় সুন্দর হইয়া উঠিল না—যৌবনরাগে রক্তিম কপোলতল প্রেম ও লজ্জার সংমিশ্রণে ক্ষণেকের তরে দ্বিগুণ রঞ্জিত হইয়া উন্মাদক হইল না—এ কি কম দুঃখ? দাম্পত্যের মলয়-বাতাসে বিকাশোন্মুখ যৌবনকুসুমটি নাচিয়া নাচিয়া দুলিতে পাইল না—তৃষ্ণাভরা আকুল চাতক "হা জল হা জল" করিয়া চাহিয়া একবিন্দু তৃষ্ণার জল পাইল না—এ কি কম ব্যথা?—

ইহার জন্য কে দায়ী? ভগবান্, অদৃষ্ট, সমাজ, প্রতাপ, চন্দ্রশেখর, না—শৈবলিনী নিজে? দয়া, মমতা, স্নেহ, ভালবাসা সকল সময়ে পাত্রাপাত্র বিচার করিয়া জন্মে না। প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, হৃদয়ের ব্যথা সকল সময়ে সংযমরুদ্ধ করিয়া সকলে সন্ন্যাসিনী বা সংযমের অধিদেবতা হইয়া থাকিতে পারে না। তাহা হইলে শৈবলিনী যে পাপিষ্ঠা—সমস্ত দোষ কি কেবল একা তাহারই?

শৈবলিনী হতভাগিনী পাপিষ্ঠা হইলেও শৈবলিনীর স্রষ্টা তাহাকে ভালবাসিতেন। দোষ করিলেও ভালবাসার পাত্রকে সকলে ত্যাগ করে না, বাহিরে ত্যাগ করিয়াও অনেকে তাহার স্মৃতিকে সযত্নে পোষণ করিয়া রাখে। স্নেহ ও ভালবাসার পাত্র সকল অবস্থাতেই ক্ষমার দাবী করিয়া থাকে। ইহলোকে নরকভোগ দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া গৃহে স্থান দেওয়ায় এই ক্ষমার দাবীই তাহার প্রকাশ পাইয়াছে। এ যেন কলুষিতা দেবী-প্রতিমাকে পুনঃসংস্কার করিয়া গৃহে স্থান দান। মানসব্যভিচারিণী (শাস্ত্রমতে, কলিযুগে মানস পাপের গুরুত্ব অল্প) হইয়াছে বলিয়া তাহার জীবনটি কি জন্মের মত নষ্ট করিয়া দিতে

হইবে? সুবর্ণে খাদস্পর্শ ঘটীয়াছে বলিয়া কি তাহা বিশুদ্ধ করিয়া লইতে হইবে না? জন্ম-দুঃখিনী, অদৃষ্টের ফেরে বিড়ম্বিতা, শৈবলিনী মানস-ব্যভিচারিণী হইলেও সে দয়ার অযোগ্যা নহে। কবি ন্যায়বান্ বিচারকের মতই যে, ন্যায়বিচার করিয়া শৈবলিনীকে নূতন ভাবে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া পতিগৃহে স্থান দিয়াছেন, তাহা ন্যায্যই হইয়াছে।

আমরা অন্যায় কার্য্যমাত্রের নিন্দা করিয়া থাকি; কি ঘটনাচক্রে, কি সঙ্কট অবস্থায় পড়িয়া ঐ কার্য্য সংঘটিত হয়, তাহা অনেক সময়ে দেখি না। তবে ইহাও সত্য যে, লোকশিক্ষার দিক্ দিয়া দেখিলে, অনেক সময়ে যাহা সচরাচর ঘটিয়া থাকে বা ঘটিতে পারে—সেই দিক্ দিয়াই বিচার করার আবশ্যক হয়।

শৈবলিনী প্রতাপকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিল, অথচ তাহাকে সে পাইল না। মুখে চঞ্চল হাসি খেলিল না, অপাঙ্গে কটাক্ষ-বিক্ষেপ দেখা দিল না। মনোবেদনার কণ্টকশয্যায় শুইয়া যুবতী একাকিনী বিনিদ্র রজনী কাটাইয়া দিলেও আহা বলিবার তাহার কেহ নাই। "মাধবীলতার" "হেমলতা", উদার প্রেমময় পতিকে লাভ করিয়া, সৌভাগ্যদেবীর মত "শৈলবালা"কে রাত্রিদিন সঙ্গিনী রূপে পাইয়াছিল বলিয়া অত সহজে আপনাকে সামলাইয়া লইতে পারিয়াছিল।

শৈবলিনী চন্দ্রশেখরকে উদার বা প্রেমময় দূরে থাক্, উদাসীন, শাস্ত্রৈকচিত্ত এবং অপ্রণয়ী বলিয়াই বুঝিয়াছিল। চন্দ্রশেখর এত উর্দ্ধে, মর্ত্ত্যের শৈবলিনী তাহার নাগাল পাইল না। বেদ, বেদান্ত, জ্যোতিষ, পুরাণ এবং তন্ত্র যাঁহার সর্ব্বস্ব,

যুবতী পত্নীর স্থান তাহাতে কোথায়? শৈবলিনী, এই ভাবিয়া চন্দ্রশেখর হইতে আপনাকে যথাসম্ভব দূরে দূরেই রাখিয়াছিল। প্রচণ্ড অভিমানভরা, ক্ষুব্ধ, অপমানিত এবং বিদ্রোহী মন লইয়াই সে সংসারিণী সাজিয়াছিল। যুবতী যাহা চাহে, তাহা ত পাইলই না। যৌবনের বাসন্তীলতা নৈরাশ্যের তাপে ভিতরে ভিতরে কেবল শুষ্কই হইতে লাগিল।

চন্দ্রশেখর জ্ঞানী এবং জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ হইতে পারেন, তাহাতে শৈবলিনীর কি? কণ্ঠভরা যাহার তৃষ্ণা, তাহার কাছে স্বর্গের দুষ্প্রাপ্য অমৃতের মূল্য কি? অগাধ জলরাশি বক্ষে ধরিয়া মহাহ্রদ যদি পিপাসিতের তৃষ্ণা দূর না করিল, তবে তাহার মহাহ্রদত্ব কি? শৈবলিনীর উপর চন্দ্রশেখরের গভীর প্রেম ছিল, (তাহা বেদবেদান্তের পুঁথিগুলির দাহ হইতেই বুঝা যায়) তথাপি চন্দ্রশেখর একদণ্ডের তরেও দেখিবার মত করিয়া শৈবলিনীকে দেখেন নাই! সাংসারিক দিক্ দিয়া ইহা তাঁহার দোষ। জ্ঞানী পণ্ডিত হইয়া চন্দ্রশেখরই ভুল করিলেন, অন্যাসক্তা মর্ম্মপীড়িতা যুবতী যে সাংঘাতিক ভুল করিয়া বসিবে, তাহাতে অস্বাভাবিকতা কি আছে? চন্দ্রশেখরের উপেক্ষা বা ঔদাসীন্য পাইয়া শৈবলিনীর অভিমানাহত শুষ্ক হৃদয়ে পূর্ব্বানুরাগবহ্নি শতগুণ জ্বলিয়া উঠিল। সর্ব্বনাশী যে ভিতরে ভিতরে কালসাপটিকে দুধ কলা খাওয়াইয়া বক্ষের মধ্যে পুষিতেছিল, তাহা কেহ জানিল না। শৈবলিনীর বলবতী নিয়তি "সুন্দরীকে" "মাধবীকঙ্কণের" "শৈল" করে নাই; করিলে হয়ত রোগ বুঝিয়া চিকিৎসার ভার লইতে পারিত।

শৈবলিনী ভাদ্রের দুইকূলভরা গঙ্গার আকুল তরঙ্গ বক্ষে ধরিয়া সরসীর মত কখন স্থির থাকিতে পারে না, ব্যথাদীর্ণ তাহার হৃদয়ের তন্ত্রীতে রসপূর্ণ সুখসঙ্গীত কখন ফুটিতে পারে না, বা তাহার দগ্ধ জীবন-তরুটির শাখাপ্রশাখা শ্যামল পত্রপল্লবে ভরিয়া উঠিয়া স্বপ্নালস সমীরণের স্পর্শে কখন নাচিয়া উঠিতে পারে না। শৈবলিনী জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে মুমূর্ষুর মত বহুদিন অবস্থান করিয়া শেষে ধর্ম্ম, সমাজ এবং হৃদয়—সকল দিক্ দিয়া নিন্দিত কুলত্যাগ করিয়া গেল, নৈরাশ্য ও অপমানে জ্বলিয়া পুড়িয়া সর্পীর মত প্রেমাস্পদকে দংশন না করিয়া তাহার উদ্ধার সাধনই করিল। গঙ্গাগর্ভে শপথ করিয়া শৈলশিখরে উন্মাদিনীর মত ভ্রমণ করিয়া ইহজীবনেই নরকভোগ করিয়া শেষে নিষ্পাপ ও বিশুদ্ধা হইয়া উঠিল,—ইহাই তাহার চরিত্রের বিশিষ্টতা।

যাহা হউক,—ফষ্টর সাহেব নিদ্রিতা শৈবলিনীকে লোকজনের দ্বারা শিবিকায় চড়াইয়া নৌকায় তুলিল। শৈবলিনী যখন জানিল, নৌকা মুঙ্গেরে যাইবে, তখন তাহার বহুদিনের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তকাল মেঘগ্রস্ত বলিয়া পূর্ণচন্দ্রকে উপেক্ষা করিয়া কোন্ অদৃষ্টের আকর্ষণে সে যে আজ দুর্গন্ধ জলাভূমিতে আসিয়া পড়িল, তাহা একেবারে বুঝিতেই পারিল না। শৈবলিনীর সাহস, কি দুঃসাহস, সবই অদ্ভুত। দুঃসাহসিনী না হইলে ছুরিকার ভয় দেখাইয়া ফষ্টর সাহেবের কবল হইতে সে কখন আত্মরক্ষা করিতে পারিত না।

শৈবলিনীকে লইয়া নৌকা ভাগীরথী-বক্ষ বাহিয়া মুঙ্গের অভিমুখে চলিল। কবি ইহার যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা বড়ই

সুন্দর। * * * "প্রভাতবায়ু-চালিত ক্ষুদ্ধ তরঙ্গমালার উপর আরোহণ করিয়া শৈবলিনীর সুবিস্তৃতা তরণী উত্তরাভিমুখে চলিল * *।" এই-স্থানেই প্রভাতবায়ুর বর্ণনা বড়ই প্রস্তুতোপযোগী। প্রতাপের প্রতি শৈবলিনীর প্রেম প্রথমে প্রভাতবায়ুর মতই শান্ত ও মধুর ছিল। সেই প্রেম—কুমারীর সেই বাল্যপ্রেম একটি কোমল গন্ধ, একটি মৃদুল স্পর্শ, একটি অপূর্ব্ব সুখসঙ্গীতের সৃষ্টি করিয়া দিল। ক্রমে প্রভাতের সেই শান্ত মধুর বাতাস প্রবল বাতাসরূপে দেখা দিতে লাগিল। কৈশোর বয়সে, নব-যৌবনের নব-মধুপানে মাতোয়ারা হৃদয়ে তখন কি ঘন ঘন কম্পন! প্রবল বাতাস ক্রমে ক্রমে ঝটিকায় পরিণত হইয়া পড়িল। তখন তাহার কি ভীষণ গর্জ্জন! যৌবনের উন্মত্ততার এবং প্রণয়ের নৈরাশ্যেরই বা কি প্রচণ্ড হাহাকার! সে গর্জ্জনের সহিত, সে হাহাকারের সহিত তাল রাখিয়া তখন হৃদয়-নদীও গর্জ্জিয়া উঠিল; তরঙ্গ শ্রেণী ফুটিয়া উঠিয়া মাথা নাড়িয়া, আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ধৈর্য্যতরী আর বুঝি রক্ষা হয় না!

শৈবলিনীর প্রতিবেশিনী "সুন্দরী," নাপিতানী ছদ্মবেশে ফষ্টরের নৌকায় শৈবলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিল। পোড়ারমুখী আর বেদগ্রামে পতির নিকট ফিরিতে সম্মতা হইল না। গৃহে যখন সুখ নাই, তখন কলঙ্কের পশরা মাথায় লইয়া কোন্‌মুখে সে গৃহে ফিরিবে? কাশী যাইয়া বাস করিবে কিম্বা জলে ডুবিয়া মরিবে।

শৈবলিনীর ইহা মিথ্যা কথা। মনের ইহা ক্ষণিক উচ্ছ্বাস মাত্র। প্রতাপকে চক্ষুর উপর জলে ডুবিতে দেখিয়া যে মরিতে চাহে নাই, প্রতাপকে লাভ করার আশার শেষ পর্য্যন্ত না

দেখিয়া সে কখনই মরিতে পারে না। অতবড় উচ্চ আশা, অতবড় প্রাণভরা তৃষা যাহার—সে কি মরে? এতদিন ঐ আশা ও তৃষা মর্ম্মতলে গুপ্তই ছিল, আজ তাহা উন্মাদভাবে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। শৈবলিনীর পাপহৃদয় এক অনিশ্চিত সুখলাভের আশায় তখন নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছে। সে কি মরে?

সুন্দরীর মুখে শৈবলিনীর অপহরণবৃত্তান্ত শুনিয়া প্রতাপ নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়াও শৈবলিনীকে উদ্ধার করিল। ভৃত্য রামচরণ মূর্চ্ছিতপ্রায় শৈবলিনীকে আনিয়া প্রতাপের শয়নগৃহেই রাখিয়া দিল। গৃহে যাইয়া অকস্মাৎ প্রতাপ—"জ্বালিত প্রদীপালোকে দেখিল—শ্বেতশয্যার উপর কে প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্মরাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে। যেন বর্ষাকালে স্থির বারিবিস্তারের উপর কে প্রফুল্ল শ্বেতপদ্মরাশি ভাসাইয়া দিয়াছে। মনোমোহিনী শোভা স্থির দেখিয়া প্রতাপ সহসা চক্ষু ফিরাইতেই পারিল না—অনেক দিনের কথা মনে পড়িল। অকস্মাৎ স্মৃতিসাগর মথিত করিয়া তরঙ্গের উপর তরঙ্গ প্রহত হইতে লাগিল। "এ কি এ" বলিয়া শৈবলিনী পালঙ্কে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল।"

প্রগাঢ় আনন্দের পর অকস্মাৎ বড় বিপৎপাত ঘটিলে কিম্বা গভীর বেদনার পর অপ্রত্যাশিত সুখ-ঘটনা উপস্থিত হইলে ভাবময়ী নারীরা এইরূপ মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়ে। এত বিস্ময়, এমন আনন্দ, এরূপ অসম্ভব-সম্ভাবনা, বিশেষ এইভাবে অন্তরের আকাঙ্ক্ষিত মানসদেবতার সম্মুখে উপস্থিতি, বেগবান্ চিত্তে একটি আলোড়ন আনিয়া দিয়াই থাকে।

কিয়ৎক্ষণ পরে শৈবলিনীর যখন সংজ্ঞা ফিরিল, তখন শৈবলিনীর হৃদয়মধ্যে অগ্নি জ্বলিতেছিল, তাহার নখ পর্য্যন্ত কাঁপিতেছিল, সর্ব্বাঙ্গে কদম্বকোরকের মত রোমাঞ্চ ফুটিয়া উঠিতেছিল।

তারপর শৈবলিনী শুনিল, প্রতাপের মুখ হইতে শুনিল—"তোমার মত পাপিষ্ঠার মুখ দেখিতে নাই" শৈবলিনীর গর্ব্বিত নারীহৃদয় সে আঘাতে একেবারে দমিয়া গিয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। তেজস্বিনী নারী সমস্ত ভুলিয়া, মান অভিমান, উপেক্ষা ও অপমানের দিকে না চাহিয়া বাষ্পগদ্গদ হইয়া বলিল, "আমাকে সেইখানে মারিয়া ফেলিলে না কেন?" উত্তরে প্রতাপ কহিল—"তোমার মরণই ভাল।" আঘাতের উপর আঘাত। দুর্ব্বল, অভিমানী বা মনস্বীরা কোন বড়রকমের অপমান বা তাচ্ছিল্য সহ্য করিতে না পারিলেই কাঁদিয়া ফেলেন। শৈবলিনী তাই কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল—"কাহার জন্য সুখের আশায় নিরাশ হইয়া কুপথ-সুপথ-জ্ঞানশূন্যা হইয়াছি? কাহার জন্য দুঃখিনী হইয়াছি? কাহার জন্য আমি গৃহ-ধর্ম্মে মন দিতে পারিলাম না? তোমার জন্য; তুমি গালি দিও না।"

প্রতাপ বীরের মত অচল অটলভাবে দণ্ডায়মান, সম্মুখে ফণা তুলিয়া ভীষণ সর্পী দংশনোদ্যতা। সংযমের বর্ম্মে ঠেকিয়া সে বিষাক্ত দংশন আজ বিফল। এই অসংযমের পার্শ্বে সংযমের চিত্র ভালরূপই ফুটিয়াছে। অভাগী যে অগ্নিতে অহর্নিশি জ্বলিতেছে; হয়—চিরদিনের মত শান্ত হইয়া যা'ক্, নয়—হৃদয় পুড়িয়া পুড়িয়া একেবারে ভস্ম হইয়া যাক্। লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অন্তরের মুক্তবেগ প্রবাহ ছুটিয়া চলিয়াছে। শৈবলিনীও

শেষ অস্ত্র ত্যাগ করিল—"তাহার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে যদি তাহাকে পাইতে পারে এই আশায় সে গৃহত্যাগিনী, নহিলে ফষ্টর তাহার কে?" যদিও সে ফষ্টর কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক অপহৃতা, তথাপি সে আপনাকে গৃহত্যাগিনীই ভাবিল। ইহাতে এমতই বুঝায় যে, গৃহত্যাগিনী হইবার আকাঙ্ক্ষা—মনে মনে সে ভাবিয়া রাখিয়াছিল; আর সেই আকাঙ্ক্ষার পূরণ হইলে প্রতাপকে পাওয়া যাইতে পারে এই আশাও হৃদয়ের মধ্যে তীব্রভাবেই পোষণ করিয়াছিল।

প্রতাপের গুরুপত্নীত্ব-সম্বন্ধ গৃহত্যাগ করিলেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে—প্রলোভন-রাক্ষসী মোহিনীবেশ ধরিয়া তখন সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। আর প্রতাপও সর্পভয়ে ভীত ব্যক্তির মত পলাইয়া গেল। ঐ কালসর্পীর বিষাক্ত দংশন, কি জানি কখন্ বর্ম্মভেদ করিয়াও দেহের মধ্যে প্রবেশ করে! বিষের জ্বালায় প্রকৃতিস্থ থাকাও অসম্ভব—আর ঘৃণা, লজ্জা ও পাপের সংসর্গে থাকাও অনুচিত—ইহা বুঝিয়া প্রতাপ সে গৃহ ত্যাগ করিল।

শৈবলিনী বুঝিল—প্রতাপকে আর পাইবার নহে। প্রতাপ-পক্ষী তার হৃদয়-পিঞ্জরে আসিয়া ধরা দিবে না। এতদিনের ক্ষীণ আশা হৃদয়াকাশ হইতে ইন্দ্রধনুর মত সহসা মিলাইয়া গেল। এইবার তাহার মরিবার ইচ্ছা হইল। আশা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—আর জীবনে মমতা কি। তখন মনে পড়িল—সেই বেদগ্রাম, সেই পতিগৃহ, সেই স্বহস্তরোপিত কবরীবৃক্ষ, সেই পরিষ্কৃত তুলসীমঞ্চ! প্রতাপের চক্ষুতে সে পাপিষ্ঠা। শৈবলিনীর

বক্ষের উপর কে যেন তখন যন্ত্রদ্বারা পেষণ করিতে লাগিল। নীরবে সে অনেক কান্না কাঁদিল। উন্মত্ত বিকারের বন্যা-স্রোত তখন সরিয়া গিয়াছে, অনুশোচনার কতকগুলি প্রস্তর খণ্ড মাত্র তথায় কর্দ্দমাক্ত হইয়া পড়িয়া আছে; সে শুভ্র হৃদয়-বালুকার চর আর নাই।

তখন শৈবলিনীর স্বামীর কথা মনে পড়িল। তাহার চলিয়া আসার জন্য তাহার স্বামী কি মর্ম্মবেদনা পাইয়াছেন। না-না —গ্রন্থই তাঁহার সর্ব্বস্ব, তিনি দুঃখ পাইবেন কেন? উজ্জ্বল কুল কলঙ্কিত করিয়া, স্বামীর পবিত্র মুখ পোড়াইয়া দিয়া আসিয়াছে বলিয়া তখন কৃতজ্ঞতা ও সহানুভূতি তার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। চন্দ্রশেখরের দেবমূর্ত্তির অস্পষ্ট ছায়া শৈবলিনীর হৃদয়-পটে ধীরে ধীরে দেখা দিল। প্রতাপের সমুজ্জল মূর্ত্তির অন্তরালে ছিল বলিয়া চন্দ্রশেখরের সে অস্পষ্ট ছায়ার বিন্দুমাত্র প্রতিফলন এতদিন তাহার লক্ষ্যে আইসে নাই।

প্রত্যাখ্যাতা নারী পদাহতা সর্পীর মত প্রণয়াস্পদকে দংশন করিবার জন্য ব্যস্ত হয়। অথচ শৈবলিনীর প্রতাপের প্রতি সে ক্রোধের ভাব দেখা গেল না। শৈবলিনী একদিকে উচ্চহৃদয়া নারী ছিল। নচেৎ একজন্মেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া চন্দ্রশেখরের গৃহে গৃহলক্ষ্মীরূপে স্থান পাইতে পারিত না।

তারপর শৈবলিনী শুনিল—তাহার উদ্ধারের জন্যই প্রতাপ ইংরাজের হস্তে বন্দী। সহানুভূতিতে হৃদয় ভরিয়া গেল। এই আকস্মিক ঘটনা না ঘটিলে চিত্তের মালিন্য ও উদাসীনতা হয়ত শৈবলিনীকে মুহ্যমান করিয়া ফেলিত। ঘটনাচক্রে কর্ম্মচারীদের

ভ্রান্তিতে শৈবলিনী নবাব মীরকাসেমের মুঙ্গেরস্থ কেল্লায় আনীত হইল। প্রতাপের উদ্ধারের আশায় নবাবের নিকট সে তখন সাহায্য চাহিল। প্রয়োজন বুঝিয়া আপনাকে প্রতাপের পত্নী বলিয়া পরিচিতা করিতেও দ্বিধা বোধ করিল না। বাসনা ত পূর্ণ হইবার নহে, তথাপি আপনাকে প্রতাপের পত্নীরূপে দাঁড় করাইয়া একটী আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার প্রবৃত্তি সে ত্যাগ করিতে পারিল না। এই পরিচয়ে তাহার অতৃপ্ত ও অশান্ত হৃদয় ক্ষণেকের জন্য তৃপ্ত ও শান্ত হইল।

কাতর ক্রন্দনে, উদ্বেল অশ্রুতে ও মর্ম্মস্পর্শী প্রার্থনায় কোন ফল হয় নাই, আর আজ উদ্ধার করার কৃতজ্ঞতা হইতে যদি প্রতাপের প্রেম লাভ করিতে পারে, পূর্ব্ব মমতা আবার যদি সে হৃদয়ে ফুটাইয়া তুলিতে পারে—এই ক্ষীণ আশা যে শৈবলিনী একেবারে পোষণ করে নাই, তাহা বলা যায় না।

শৈবলিনী প্রকৃতই মূল স্বার্থত্যাগের জন্য প্রতাপের উদ্ধারে ব্রতী হয়, তাহা নহে। সে কেন গেল, কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে —অত বিচার করিয়া সে যায় নাই, ইহা নিশ্চিত। হৃদয়ের আবেগময় আকর্ষণেই এই দুঃসাহসিক কার্য্যে সে অগ্রসর হইয়াছিল। যাহার চক্ষুতে সে পাপিষ্ঠা, যে তাহার হৃদয়ে অগ্নি জ্বালাইয়া, নিভাইবার আদৌ যত্ন পায় নাই— সেই প্রতাপের জন্য শৈবলিনী কি না করিল। উপকারের প্রত্যুপকার, কৃতজ্ঞতার পুরস্কার, তাহারই জন্য বন্দী প্রণয়াস্পদের দুঃখানুভবনে কাতরতা কিম্বা আবেগময় তীব্র আকর্ষণ—ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি শৈবলিনীর কার্য্যে অধিক সহায়তা করিয়াছে, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

বুদ্ধিমতী শৈবলিনীর যত্নে প্রতাপ উদ্ধার পাইল। দুইজনে ইংরাজের নৌকা হইতে সাঁতার দিয়া যখন অনেক দূরে নিরাপদ স্থানে আসিয়াছে, তখন প্রতাপ ভাবিল, এ ক্ষুদ্র নদীতে সাঁতার দেওয়া কত তুচ্ছ! যে কালসমুদ্রে সে ভাসিতেছে—তার কাছে এ সাগরে গোষ্পদ। আর শৈবলিনী ভাবিল, যে অতলে সে ভাসিতেছে, তার নিকট এ কি! এ নদীর ত তল আছে, সে যে অতল!

যে প্রতাপ বিবাহের পর হইতে শৈবলিনীর চিন্তাকে মহাপাপ বলিয়া ভাবিত, জীবনদাতা গুরু চন্দ্রশেখরের ধর্ম্মপত্নী বলিয়া যাহাকে বিষবৎ মনে করিত—আজ সেই প্রতাপ সাঁতার দিতে দিতে শৈবলিনীকে ডাকিল—"শৈবলিনী—শৈ।"

শৈবলিনী প্রতাপকে যে কি অসমসাহসিক কার্য্যের দ্বারা উদ্ধার করিয়াছে, সেই কথা ভাবিয়া প্রতাপের হৃদয়েও সমবেদনা আসাই স্বাভাবিক। আর সে সমবেদনা চিত্তদমনের সহায়তা করা দূরে থাক বরং শত্রুতাই করিবে, ইহাই স্থির। এই উদ্ধারব্যাপারের মধ্যে শৈবলিনীর যে চিত্রটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা প্রতাপের নিকট প্রিয়ও বটে, উদ্বেজক ও চিন্তার বিষয়ও বটে। অন্তরের বালুকাস্তূপের মধ্যে ভালবাসার যে রুদ্ধ প্রবাহ এতদিন চাপা পড়িয়াছিল, আজ অকস্মাৎ তাহা উৎসের আকারে ফুটিয়া উঠিল। সবিষ সর্পকে কণ্ঠহার করার মত, অদমনীয় প্রবৃত্তিকে আলিঙ্গন করার মত প্রতাপ শৈবলিনীকে ডাকিল— "শৈবলিনী, শৈ"।

"সন্তরণে প্রতাপের আনন্দসাগর উথলিয়া উঠিল। ......

শৈবলিনী সেই অগাধ জলরাশির মধ্যে চক্ষু মুদিল। মনে মনে চন্দ্রতারাকে সাক্ষী করিয়া চক্ষু মুদিল।" শৈবলিনীর তখন আত্মবিস্মৃত ভাব! ইহা স্বপ্ন কি জাগরণ, সে উদ্বোধই নাই। এ সুখ-স্রোতে সে ভাসিতে চাহে; প্রণয়ের স্বপ্নমোহে, আবেশের এ ঘুমঘোরে সে ডুবিয়া থাকিতেই চাহে! তাই শৈবলিনী চক্ষু চাহিল না। বহুদিনের স্মৃতি-সাগর মথিত করিয়া অমৃত মিলিবার সুযোগ আসিয়াছে, সে চক্ষু চাহিবে কি?

শৈবলিনী চক্ষু বুজিয়াই কহিল—"এ মরা গাঙ্গে চাঁদের আলো কেন?"

অভাগীর হৃদয়-মরুভূমিতে মরুদ্যান দেখা দিয়াছে। গঙ্গার জলে ষোলকলা চাঁদ হাসিয়া উঠিয়াছে। শৈবলিনী তখন ভাবিতেছে—নিরাশার আঁধারে নিমগ্ন প্রাণের মধ্যে অতীত সুখস্মৃতির যেন বিদ্যুৎ চমকাইতেছে!

প্রতাপ কহিল—"চাঁদের—না সূর্য্যের?" শৈবলিনীর নিকট যাহা শারদচন্দ্র-রশ্মিবৎ শীতল, প্রতাপের নিকট তাহাই নৈদাঘ-সূর্য্যকরবৎ তীব্র। চাঁদের কিরণ গঙ্গার জলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রতাপের কাছে সে আর চাঁদের কিরণ নহে।

"তুহিনদীধিতিস্তস্য দবদহনঃ" (দবদহন—অগ্নি)

প্রতাপ আজ যে কঠোর সংকল্প স্থির করিয়াছে, তাহা ঐ সূর্য্যকিরণের মতই ভাস্বর। সেই আলোকই আজ তাহাকে নূতন জীবন আনিয়া দিবে, যত কিছু পাপ ও মালিন্য আঁধাররাশির মত দূর করিবে। দুঃখ যাতনার অবসানে আনন্দময়ী শান্তির দিন আবার হাসিয়া উঠিবে।

প্রতাপ তখন তাহার মরণবাঁচন ও শুভাশুভের জন্য শৈবলিনীকে দায়ী করিয়া অতি ভয়ানক শপথের কথা বলিল। সে শপথ শৈবলিনীর কাছে বড় মর্ম্মান্তিক। সুখের সঙ্গে সুখের স্মৃতি পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হইবে—এ প্রতিজ্ঞা না করিলে গঙ্গার জলে প্রতাপ ডুবিবে! প্রতাপের প্রতিজ্ঞা কিরূপ দৃঢ়, শৈবলিনী তাহা ভালরূপেই জানে। শৈবলিনীর জীবন-নদীতে এই প্রথম বিপরীত তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হইল।

"আমি মরি ক্ষতি নাই। আমার জন্য প্রতাপ মরিবে কেন?"

শৈবলিনীর এই আত্মত্যাগ তাহাকে পরিবর্ত্তনের পথে লইয়া গেল। সে প্রতাপকে ভুলিতে প্রতিজ্ঞা করিল। হৃদয়-নিখাত স্মৃতি-লতাটিকে মূলসহ তুলিয়া ফেলিতে কৃতসংকল্পা হইল। জীবনমরণের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান প্রতাপের সম্মুখে শৈবলিনী এই প্রতিশ্রুতি দিল। আজ হইতে সে শৈবলিনী মরিয়া গেল!

দহ্যমান অরণ্য হইতে অরণ্যচর জীবের মত শৈবলিনী প্রতাপের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া পলাইয়া গেল। আপনাকে অক্ষম বিবেচনা করিয়া সে এই রণে ভঙ্গ দিল। তখন সে পর্ব্বতের উপলব্যথিত পথে চলিতে লাগিল। শরীর ঘন ঘন কম্পিত। পিপাসার্ত্তা, উন্মাদিনী নারী, লতাগুল্ম ও শিলারাশির মধ্য দিয়া অনিশ্চিত লক্ষ্যে ছুটিয়া গেল। গভীরা রজনী—সে উদ্বোধই নাই।

এক এক জাতীয় প্রকৃতি আছে; যাহারা নামিবার সময়ে খরগতি, উঠিবার সময়ে তেমনই ক্ষিপ্রগতি। শৈবলিনীর প্রকৃতিও

এই জাতীয়। শৈবলিনীর মনের গতি, কি ভাল, কি মন্দ, তুই দিকেই এমনই প্রখর, এমনই তুর্দ্দম।

এইবার শৈবলিনীর অভিনব জীবনের সূত্রপাত। এ এক প্রকার পুনর্জ্জন্ম। পুরাতন জীবনের সংস্কারগুলি জীর্ণ অশ্বথপত্রের মত খসিয়া পড়িতে লাগিল। কঠোর প্রায়শ্চিত্তে এবং ইহজীবনেই পাপের ফলভোগে কর্ম্ম যখন ক্ষীণ হইয়া আইসে, তখনই পুণ্যের স্বাভাবিক সুন্দর শ্রী ফুটিয়া উঠে। শৈবলিনীর কঠোর প্রায়শ্চিত্ত এবং পাপকর্ম্মের ফলভোগে কর্ম্মক্ষয় হইতে আরম্ভ হইল।

শাস্ত্রে বলে—অতি উৎকট পাপের ফল ইহজন্মেই ভোগ হয়। না হইলে পরলোক বা জন্মান্তরে ভোগ করার প্রয়োজন পড়ে। এ ভোগ সংস্কারমূলক, মানসিক। মানস ব্যভিচারিণী না হইলে হয়ত বর্ত্তমানজন্মেই ভোগরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইয়া দানবীর দেবীত্বে পরিণত ঘটিত না। শৈবলিনীর এই সংস্কারমূলক পাপফলভোগের মধ্যে পুণ্যবারিরূপে রামানন্দ স্বামীর কৃপা বর্ষিত হইল। জীবন যেমন নিষ্পাপ হইতে লাগিল, অমনই পুণ্যের আলোকসম্পাত সেই নিষ্পাপ জীবনের উপর পতিত হইল তখন সে ভাবিল—

"* * * এই দীর্ঘ শালতরুনিন্দিত, সুভুজবিশিষ্ট, সুন্দর-গঠন, বলময় এ দেহ যে রূপের শিখর। এই যে ললাট প্রশস্ত, চন্দনচর্চ্চিত, চিন্তারেখাবিশিষ্ট—এ যে সরস্বতীর শয্যা, ইন্দ্রের রণভূমি, মদনের সুখকুঞ্জ, লক্ষ্মীর সিংহাসন। ইহার কাছে প্রতাপ! ছিঃ ছিঃ সাগরের কাছে গঙ্গা!"

তারপর শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের সহিত নিজের তুলনা করিয়া

দেখিল। ভাবিতে লাগিল—"সমুদ্রে শম্বুক, কুসুমে কীট, চন্দ্রে কলঙ্ক, চরণে রেণুকণা—তাঁর কাছে আমি কে? সরোবরে কর্দ্দম, মৃণালে কণ্টক, পবনে ধূলি, অনলে ধূম! আমি মজিলাম, মরিলাম না কেন?

জানে যে, এই মন্ত্রে চির প্রবাহিনী নদী অন্যখাতে বহিয়া যায়—জানে যে, এ বজ্রে পাহাড় ভাঙ্গে, এ গণ্ডূষে সমুদ্র শুষ্ক হয়, এ মন্ত্রে বায়ু স্তম্ভিত হয়। শৈবলিনীর চিরপ্রবাহিতা নদী ফিরিল, পাহাড় ভাঙ্গিল, সমুদ্র শোষিল, বায়ু স্তম্ভিত হইল। শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলিয়া চন্দ্রশেখরকে ভালবাসিল।"

তারপর প্রতাপের সহিত শৈবলিনীর শেষ সাক্ষাৎ। তখন শৈবলিনী অসাধ্য সাধন করিয়াছে, প্রতাপকে ভুলিয়াছে। প্রতাপ কিন্তু শৈবলিনীকে ভুলে নাই। নরকভোগান্তে পাপের শেষফল-স্বরূপ উন্মাদরোগ ভোগ করিয়া শৈবলিনী সবেমাত্র প্রকৃতিস্থ হইয়াছে, তাই প্রতাপকে দেখিবামাত্র হস্তসঙ্কেতে তাহাকে নিকটে ডাকিল। ধীরে ধীরে—অন্যে শুনিতে না পায়—এরূপভাবে কহিল—

"যতদিন তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিও না। স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার; কতদিন বশে থাকিবে জানি না। এ জন্মে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না।"

"কতদিন বশে থাকিবে"—বোঝা গেল, এখন শৈবলিনীর চিত্ত বশে আসিয়াছে। অন্ততঃ ইহা তাহার বিশ্বাস। "এ জন্মে সাক্ষাৎ করিও না"—সংশয় থাকিয়া যায়, তবে কি শৈবলিনী জন্মান্তরে

প্রতাপের আশা রাখে? তাহা হইলে ইহাই কি বুঝিতে হইবে যে, তাহার মনটি এখনও খাদশূন্য স্বর্ণে পরিণত হয় নাই। তাহা হইতে পারে না। পাছে অসার মন আর বশে না থাকে এই ভয়েই সে এই কথা বলিয়াছে। চন্দ্রশেখরের তুলনায় প্রতাপকে তুচ্ছ ভাবিয়া যে ছিঃ ছি বলিয়া উঠিয়াছে, সে কি আর চন্দ্রশেখরকে ভুলিয়া আবার প্রতাপকে ভাল বাসিতে পারে? বিশেষ নরক-ভোগের পরে, পাপাবশেষরূপ উন্মাদরোগ-ভোগের পরে পাপবাসনা কি আর থাকিতে পারে? এই কঠোর প্রায়শ্চিত্ত, এই অত্যাশ্চর্য্য সাধনার ফল, মাত্র ইহলোকব্যাপ্য হইতে পারে না। রামানন্দ স্বামীর কৃপা, চন্দ্রশেখরের মহত্ব বা প্রতাপের স্বার্থত্যাগও যে বিফল হইবে, ইহাও সম্ভব নহে।

"রজনী" উপন্যাসের লবঙ্গলতা অমরনাথের অনুরাগিনী, প্রথম যৌবনে তাহাকে দণ্ডদান করিয়া বিশেষরূপে অনুতপ্তা। তদুপরি আবার অমরনাথের মহত্ব ও আত্মত্যাগ দর্শনে গৌরবাভিভূতা। আর, বৃদ্ধ স্বামীতে, প্রকৃতিরই অলঙ্ঘ্য নিয়মে অসম্যক্-পরিতৃপ্তা —কাজেই "ইহজন্মে তুমি আমার কেহ নহ" বলিয়া লবঙ্গলতা পরলোকের আশা পোষণ করিয়া গিয়াছে। "যদি পরলোক থাকে" বলিয়া এই আশাটিকে অপ্রকাশও রাখে নাই। লবঙ্গলতা ত আর শৈবলিনীর মত কঠোর প্রায়শ্চিত্ত, অন্যানুরাগের বিষময় ফল নরক-ভোগ করিয়া যায় নাই যে, চিত্তনদীকে চিরদিনের মত বিপরীত খাতে বহাইয়া লইয়া যাইবে। তবে প্রতাপের মত লবঙ্গলতাও ইন্দ্রিয়জয়ের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য বিশ্ববাসীর চক্ষুতে ফুটাইয়া তুলিয়াছে ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

শৈবলিনী ও প্রতাপ।

প্রতাপ হৃদয়ের অগ্নিতে পুড়িয়া পুড়িয়া দগ্ধ হইয়াছে—তথাপি সে অগ্নির স্ফুলিঙ্গমাত্র বাহিরে প্রকাশ পাইতে দেয় নাই। শৈবলিনীর সুখের জন্য প্রতাপ শেষে আপনাকে বলি পর্য্যন্ত দিয়া গেল। প্রতাপ নিজের দুঃখ হইতে অব্যাহতির আশায় প্রাণত্যাগ করে নাই, কিম্বা নিরাশায় দগ্ধ হইয়া হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া চিত্তদৌর্ব্বল্য-বশেও আত্মহত্যা করে নাই। প্রতাপের এ মরণ কঠোর আত্মত্যাগ, অপূর্ব্ব মনোজয়। এই আত্মত্যাগের ফলে প্রতাপ যে, শৈবলিনীর প্রতি অনুরাগ এবং তাহার পাপময়ী স্মৃতি পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া গিয়াছে—তাহা আমরা প্রতাপের মৃত্যুকালে রামানন্দ স্বামীর আশীর্ব্বাদ-বাণী হইতেই বুঝিতে পারি—

"শত শৈবলিনী পদপ্রান্তে গড়াগড়ি যাইবে।" আকাঙ্ক্ষার জয় হইয়াছে, আকাঙ্ক্ষিতের আর প্রয়োজন নাই। কাজেই শৈবলিনীকে পাওয়ার তৃপ্তি অপেক্ষা স্বর্গে শতগুণ তৃপ্তি লাভ হইবে। অমরনাথ এবং লবঙ্গলতার পরলোক বা জন্মান্তরে মিলন হইয়া উভয়ের অতৃপ্ত আত্মা যে সুখী হইবে, ইহা মনে হয়। প্রতাপের সুখ অন্য প্রকার।

শৈবলিনী অন্তরের অগ্নি সম্যগ্‌রূপে নির্ব্বাণ করিয়া ইহজীবনে তৃপ্তি এবং শান্তিলাভ করিয়া সুখিনী হইল। চন্দ্রশেখরের সেবায় আপনাকে নিয়োজিত করিয়া দেবীত্বে উপনীত হইল। দানবী সাধনার গুণে দেবী হইতে পারে, শৈবলিনী ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

শৈবলিনী এতদিন খরস্রোতা, পঙ্কিলোদকা পার্ব্বত্য তটিনী

ছিল, আর আজ সে মৃদুতরঙ্গা, পুণ্যসলিলা মন্দাকিনী। গিরি-তটিনী এবং মন্দাকিনী, দুই ই শৈবলিনী। দেবাদিদেব চন্দ্রশেখরের শিরোভূষণা মন্দাকিনীর মত শৈবলিনীও চন্দ্রশেখরের মস্তকের মণিবৎ আদরণীয়া হইয়া রহিল।

"কীটোঽপি সুমনঃসঙ্গাদারোহতি সত্যং শিরঃ"।

নগেন্দ্রনাথ।

এইরূপ এক জাতীয় চরিত্র দেখা যায়—যাদের মনোবৃত্তি অগ্নির মত ফুৎকারে জ্বলিয়া উঠে না, ক্রমে ক্রমে তুষাগ্নির মতই ধিকি ধিকি জ্বলিয়া থাকে। আর সেই জ্বলনজনিত দাহ প্রথমতঃ উপলব্ধই হয় না, কিন্তু যখন উপলব্ধ হইতে আরম্ভ করে, তখন আর তেমন তীব্র ও জ্বালাময় বোধ হয় না। বিষবৃক্ষের নায়ক নগেন্দ্রনাথের চরিত্র এই প্রকারের। এই জাতীয় মনোবৃত্তির দমন করার শক্তি পাতঞ্জলোক্ত যোগরূপ উপায়ের মধ্যে নাই। বেদান্তবাক্যবিচারাদি সরল উপায় অবলম্বনেই কিছু ফলের আশা থাকে মাত্র।

যে-জাতীয় তীব্র মনোবেগ ও আকুল উচ্ছ্বাস মানবকে দেবতা বা অমর করিয়া তুলে, লম্পট হত্যাকারী অথবা সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী করিয়া দিতে পারে, তাহা এই জাতীয় চরিত্রে দেখা যায় না। ধর্ম্ম ও সমাজকে অগ্রাহ্য করিয়া, আপনার জনের মুখপানে দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া কেবল মনোবৃত্তির টানে ভাসিয়া যাওয়া এই জাতীয় মানবের প্রকৃতি নহে। অধীর, ভাবাবেগচালিত, স্রোতোবশগ তৃণের মত ইহারা কখন অবশ হইয়া ভাসিয়া যায় না। বিপরীত জাতীয় নগেন্দ্রনাথ তাই মনে মনে কুন্দের আন্তরিক ইচ্ছা বুঝিয়া, বিধবার বিবাহ শাস্ত্রসম্মত এবং বর্ত্তমানকালে যুক্তি-সঙ্গত—এই ভাবে আপনাকে, অন্যকে এমন কি সামাজিক ব্যক্তি-

গণকে বুঝাইয়াই বিধবার বিবাহরূপ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিল—ইহা নগেন্দ্রনাথের জাতীয় প্রকৃতিরই অনুরূপ।

"নগেন্দ্র" এই নামকরণ বড়ই সার্থক। নগ অর্থে পর্ব্বত, তাহাদের রাজা নগেন্দ্র—পর্ব্বতরাজ। আমাদের নগেন্দ্রনাথও বড় জমিদার—রাজার মতই দেশে সম্মানিত। উন্নতশিখর পর্ব্বতের মতই তাহার শির সগর্ব্বে সগৌরবে সমাজের বক্ষে দণ্ডায়মান। পর্ব্বতের পাষাণময় দেহ রৌদ্রতাপে তপ্ত, ঝড় বৃষ্টিতে উদ্বেজিত হইলেও বড় সহজে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায় না বা সহজে বন্ধনচ্যুত হইয়া টলে না। কিন্তু বড় রকমের ভূমিকম্পে যখন পর্ব্বতের মূলবন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে, তখনই তাহাকে ক্ষণেকের জন্য টলিতে দেখা যায়। সে সময়ে পর্ব্বতাশ্রিত লতাগুল্ম এবং তদাশ্রিত প্রাণীগণের পর্য্যন্ত সমূহ বিপদ্ ঘটে। আবার ভূমিকম্পের পর যে পর্ব্বত, সেই পর্ব্বতই থাকে।

নগেন্দ্রনাথও কুন্দনন্দিনীর রূপমোহে মুগ্ধ এবং ভোগাকাঙ্ক্ষা-তাপে দগ্ধ হইয়া প্রথমে বিচলিত হয় নাই। আপনার মনোবেগ যখন কোনমতে দমন করিতে পারিল না, তখনই তদাশ্রিত প্রিয়-জনের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল। অস্থি পঞ্জর তীব্র আঘাতে জর্জ্জরিত, মর্ম্মস্থল "হৃদয়-কুসুমশোষী" জ্বালায় উন্মথিত হইয়া উঠিল। শেষে যে নগেন্দ্রনাথ—সে-ই নগেন্দ্রনাথ রহিল!

তবে ভূমিকম্পে পর্ব্বতোপরিস্থ তরুগুলি ভাঙ্গিয়া পড়ে, তথাকার পশুপক্ষীদের কোলাহলে পর্ব্বতশিখর মুখরিত হয় নগেন্দ্র-গতপ্রাণা এবং নগেন্দ্রাশ্রিতা সূর্য্যমুখীও ভাঙ্গিয়া পড়িল। আত্মীয় স্বজন, নায়েব গোমস্তা এবং পুত্রস্থানীয় প্রজাদেরও কাতর ক্রন্দন

শোনা গেল। শেষে ক্রোধে উন্মত্ত, সুরাপানে অপ্রকৃতিস্থ নগেন্দ্র নাথ ভিতরে বাহিরে প্রকৃতই উত্যক্ত হইয়া উঠিল।

ভূমিকম্প যেমন পর্ব্বতের গাত্রে আপনার চিহ্ন রাখিয়া যায়। কুঁন্দের স্মৃতিও নগেন্দ্রনাথের জীবনে ক্ষতচিহ্নের মতই জাগরূক রহিল। কুন্দের মৃত্যুবেদনাচ্ছন্ন মুখের বিদ্যুন্নিন্দিত হাসি বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত নগেন্দ্রনাথের স্মৃতিপথ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যায় নাই।

সংসারে সুখী বলিতে যাহা বুঝায়, নগেন্দ্রনাথ সেই সুখী পুরুষই ছিলেন। রাজার মত ঐশ্বর্য্য, মদনের মত রূপসৌন্দর্য্য, দেবতার মত সর্ব্বজনমান্য চরিত্র আর সূর্য্যমুখীর মত পতিপ্রাণা আদর্শ ভার্য্যা কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? এইরূপ শুভাদৃষ্ট লইয়া মর্ত্ত্যে বড় বেশী লোক জন্মগ্রহণ করে না। দাম্পত্য-জীবনের স্নিগ্ধ ছায়াতলে বসিয়া, আদরে সোহাগে, গর্ব্বে গৌরবে তাহার জীবন বড়ই সুখে কাটিয়াছিল। কখন কুসুমাকীর্ণ বকুলবেদিকার তলে বসিয়া, বসন্তের ছায়ালোক-বিচিত্রিত গোধূলির বেলায় সরসীবক্ষে স্বপ্নালস সমীরণের ক্রীড়া দেখিতে দেখিতে নগেন্দ্রনাথ সূর্য্যমুখীর সঙ্গে ভালবাসার আলাপ করিত। কখন কৃত্রিমশৈলে সূর্য্যমুখীকে বসন্তপুষ্পাভরণময়ী গৌরীর মত সাজাইয়া, কখন বা উদ্যানপথে সুভদ্রার মত সারথিসাজে সজ্জিত করিয়া তাহাকে অশ্ববাহিত রথ ছুটাইতে দিয়া কৌতুক-সুখ অনুভব করিত।

সুঁখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ না হইলে সৃষ্টির খেলা চলে না। সুখ-দুঃখের এই চক্রবৎ পরিবর্ত্তনই জগতের নিয়ম। এই পরিবর্ত্তনরূপ বৈচিত্র্য না থাকিলে মনুষ্যত্বের পরীক্ষা হয় না।

অভিমান, বিরহ, নৈরাশ্য বা বেদনা না থাকিলে ভালবাসার স্বরূপও প্রকটিত হয় না। ধরার সুখ নিরবচ্ছিন্ন এবং দুঃখস্পর্শশূন্য হইলে জীবন একঘেয়ে, মাধুর্য্যশূন্য হইয়া পড়ে। মিলনের নদীতে জোয়ার ভাটার খেলা, মধ্যে মধ্যে বন্যা আসা, প্রকৃতিরই নিয়ম। পৃথিবীতে নদনদীর এক কূল ভাঙ্গে, অন্য এক কূল গড়িয়া উঠে—ইহা বিধাতারই ইচ্ছা।

একদিন রাত্রে ঝড় বৃষ্টিতে আশ্রয়-আশায় নগেন্দ্রনাথ এক দরিদ্রের ভগ্ন কুটীরে গিয়া আশ্রয় করে ; শেষে আশ্রয়হীনা এক বালিকার আশ্রয়স্বরূপ হইয়া গৃহে ফিরিল। সেই বালিকাই কুন্দনন্দিনী। সূর্য্যমুখী চন্দনলতাভ্রমে বহ্নিশিখাকে আপনার গৃহ-মন্দিরে বরণ করিয়া লইল, এবং শুভাদৃষ্টবোধে দুর্ব্বার নিয়তিকে আপনার উদার বক্ষে স্থানদান করিল। এইরূপে দত্তগৃহে—সূর্য্যমুখীর সাধের সুখোদ্যানে—বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হইল।

নীল আকাশে—চন্দ্রকরচ্ছটা দেখিয়া সৌন্দর্য্যপ্রিয় মানব মুগ্ধ হইয়া প্রশংসা করে। আমাদের নগেন্দ্রনাথও কুন্দনন্দিনীর স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য এবং সরল প্রকৃতির গুণে মুগ্ধ হইয়াই সূর্য্যমুখীর নিকট পত্র লিখিয়া প্রশংসা করিল। নগেন্দ্রনাথের বয়স তখন ত্রিংশৎ বৎসর, সূর্য্যমুখী ষড়বিংশতিবর্ষীয়া। এ অবস্থায় নগেন্দ্রনাথের বালিকার উপর স্নেহ জন্মিবারই কথা। কুন্দনন্দিনী তখন ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকামাত্র।

কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রনাথের অহেতুকী দয়ার পরিচয় পাইয়া, দেবতার মত অনিন্দিত কান্তি দর্শন করিয়া, কিশোর বয়সে মুগ্ধ হইয়া গেল। শ্রদ্ধায়, কৃতজ্ঞতায় ও ভক্তিতে তাহার কোমল বক্ষ

ভরিয়া উঠিল। চুপি চুপি অন্তরের ভিতর অন্তর লুকাইয়া কুন্দ ভালবাসিল। শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির বেশ ধরিয়া প্রেম-দেবতার আগমন দেখা দিল।

কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রের প্রথমে অনাবিল স্নেহমাত্রই জন্মিয়াছিল—তাহা সূর্য্যমুখী-উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রেই জানিতে পারা যায়। "কমল তাহাকে (কুন্দকে) লেখাপড়া শিখাইতেছে। কমল বলে—(নগেন্দ্র এস্থানে অজ্ঞাতসারে নিজ মনের ধারণাই প্রকাশ করিল) লেখাপড়ায় তাহার দিব্য বুদ্ধি। কিন্তু সে অন্য কোন কথাই বুঝে না। * * * বলিলে বৃহৎ নীল চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া চাহিয়া থাকে ; কিছুই বলে না—আমি সে চক্ষু দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক হই।" বিশুদ্ধ স্নেহ ব্যতীত অপর কোন ভাব নগেন্দ্রের হৃদয়ে জন্মে নাই। জন্মিলে অন্যমনস্ক হইবার কথা সূর্য্যমুখীকে নগেন্দ্র কখন লিখিয়া জানাইতে পারিত না।

সূর্য্যমুখীর মনে সন্দেহের কোন রেখা অবশ্য পড়ে নাই—তাই রহস্য করিয়া উত্তরে জানাইল—"যদি কুন্দকে স্বয়ং বিবাহ করার ইচ্ছা থাকে ত, বল—আমি বরণডালা সাজাইতে বসি।" তবে ইহা স্থির যে, সতী সাধ্বীর অন্তঃস্থলে ভবিষ্যদ্ বিপদের একটি অস্ফুট ছায়া এস্থানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সত্ত্ব-প্রধান ব্যক্তির মুখের বাণীতে বা লেখার মধ্যে রহস্যচ্ছলে কখন কখন এইরূপে সত্য প্রকাশিত হইয়া থাকে—ইহা দর্শনের প্রমাণিত সিদ্ধান্ত।

নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর ইচ্ছায় তাহার ভ্রাতা তারাচরণের সহিত কুন্দের বিবাহ দিল। এ বিবাহে কুন্দের কোন অনিচ্ছা থাকিতে

পারে—এ সম্ভাবনা কাহারও মনে জাগে নাই। নগেন্দ্রের প্রতি কুন্দের অপরিমিত প্রেম ছিল। পাইবার বাসনা সে করে নাই, এ আশা তাহার কাছে দুরাশা বলিয়াই মনে হইত। আপনার নৈরাশ্যে সে আপনি সহ্য করিত, ভাবে ইঙ্গিতে কাহারও নিকট সে হৃদয়ের দ্বার খুলে নাই। কুন্দ বাহিরে তারাচরণের স্ত্রী ছিল মাত্র, কিন্তু সে স্বামীকে ভালবাসার পুষ্পাঞ্জলি দেয় নাই। যাহা দিয়াছিল—তাহা ক্রীতদাসীর ক্রয়ের মূল্য মাত্র। অদৃষ্টের লিখনে সে বিধবা হইয়া দত্তগৃহে স্থায়ী আসন লাভ করিল।

বলাবাহুল্য, কুন্দের বৈধব্য দশা দেখিয়া নগেন্দ্র অন্তরে বিষম ব্যথা অনুভব করিল পূর্ব্বের সেই অনাবিল স্নেহটি ঘনীভূত হইয়া নগেন্দ্রের হৃদয়ের জমাট বাঁধিয়া গেল। নগেন্দ্রের প্রতি যে ভালবাসা এতদিন নিরুদ্ধ বায়ুর মত কুন্দের হৃদয়ে নিয়ত আঘাত করিয়া আসিয়াছিল—আজ তাহা নগেন্দ্রের হৃদয়ে গিয়া স্পর্শ করিল। কুন্দের করুণ কটাক্ষপানে চাহিয়া নগেন্দ্র আপনাকে ভুলিয়া যায়। তাহার চপল অথচ রুদ্ধ গতি, ব্যাকুল অথচ উদাস দৃষ্টি, আরক্ত অথচ বিষণ্ণ মুখকান্তি নগেন্দ্রকে ক্রমশ মোহাচ্ছন্ন করিয়া তুলিতে লাগিল। কুন্দের অঙ্গে অঙ্গে উচ্ছ্বলিত, উন্মাদক যৌবনশোভা দেখিয়া, অপরিমিত প্রেমের নিত্য নূতন ভাববিকাশ লক্ষ্য করিয়া, নগেন্দ্র তাহার রূপভোগ-লালসায় একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়িল।

নগেন্দ্র কুন্দের প্রতি অনুরাগ এবং তাহার রূপযৌবনের আকর্ষণ দমন করিবার জন্য অনেক যত্ন পাইল। ভালবাসাই বল আর ভোগতৃষ্ণাই বল, বাহিরে নিরোধের ফলে ভিতরে ভিতরে তাহা

আরও প্রবল আকারই ধারণ করে। বাঁধ ভেদ করিয়া জল-স্রোত হু হু বেগে ছুটে। নগেন্দ্র তখন কুন্দকে রক্তপায়িনী জলৌকা মনে করিয়াই দূরে পরিহার করিতে লাগিল। কুন্দও ক্রমশঃ জলৌকারূপ ত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্র সর্পীর আকারে নগেন্দ্রকে অনুসরণ করিল। নিদ্রাভঙ্গে নগেন্দ্র একদিন দেখিল—কুন্দ কালীয়নাগিনীর মত তাহার সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়া গর্জ্জিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাসে তাহাকে বিষম জর্জ্জরিত করিতেছে।

নির্ম্মল আকাশে মেঘ দেখা দিল। নগেন্দ্রের জীবনে মহা-পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। জমীদারী-কার্য্যে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। বিনা অপরাধে নগেন্দ্র এখন ভৃত্যকে প্রহার করে। সূর্য্যমুখীর আনীত ঔষধ রাগ করিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়। কর্ম্মচারীদের দ্বারা অত্যাচারিত প্রজাদের আবেদন না শুনিয়াই দারোয়ান দিয়া তাহাদের হাঁকাইয়া দেয়। আদর্শ জমীদার, শীতল-স্বভাব, দয়াপ্রাণ নগেন্দ্র তখন নিষ্ঠুর, ক্রোধী এবং সুরাপায়ী।

অবস্থাগুণে মানুষ দেবতা ও দানব হয়। সকল মানুষের ভিতর সাধারণতঃ দেবত্ব, মানবত্ব ও দানবত্ব থাকে। একদিন রাত্রে নগেন্দ্র বাপীতটে নির্জ্জনে কুন্দকে একাকিনী পাইয়া প্রেম যাচ্ঞা করিল। নির্লজ্জ নগেন্দ্র কহিল—শোন কুন্দ, আমি বহুকষ্টে এতদিন সহ্য করিয়াছিলাম। আর পারিলাম না। * * আমি তোমাকে বিবাহ করিব। তুমি বলিলেই বিবাহ করি।"

নগেন্দ্র অপরিমিত প্রেমপূর্ণ ভাষায় অনুরাগার্দ্রা কুন্দের চক্ষুর উপর প্রলোভনের ছায়াচিত্র ধরিল। কুন্দ চক্ষু বুজিয়া রহিল, নগেন্দ্র তবু ভোগের উত্তেজক সুরা সেই অর্দ্ধ-আবিষ্টা ও বিমো-

হিতা কুন্দের পিপাসিত অধরে ঢালিয়া দিতে লাগিল। কুন্দ অবশ্য অধরোষ্ঠ চাপিয়া সে সুরা গ্রহণ করিল না, সকল কথার উত্তরেই না—না—বলিল।

কুন্দেরও আর মরা হইল না। কমলমণির মুখে "নগেন্দ্র তাহাকে ভালবাসেন" শুনিয়া কুন্দ আজ নগেন্দ্রের ভালবাসা জীবন্তভাবেই উপলব্ধি করিল। মুখে যতই কেন কুন্দ "না—না" করুক, অন্তর যে তার ব্যাকুল ও উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। নগেন্দ্রের প্রতি কুমারী কুন্দের প্রেম প্রকৃতই প্রেম, ইহার মধ্যে কাম বা মোহের মিশ্রণ ছিল না। এ প্রেম "মধু নবমনাস্বাদিতরসং"! বিবাহিতা অবস্থায় নগেন্দ্রের প্রতি কুন্দের প্রেমের কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় নাই। বৈধব্যের পর, এই প্রেম দমন করা বা দমন করার চেষ্টা পাওয়া কুন্দের পক্ষে উচিত হইলেও—ইহা তাহার প্রকৃতির উপযোগী হইত না।

কুন্দের উপর নগেন্দ্রের এই প্রেম রূপমোহমাত্র। রূপে গুণে আদর্শ সূর্য্যমুখীর মত পত্নীসত্ত্বে শিক্ষিত জমীদারের আশ্রিতা বিধবার উপর আসক্তিকে প্রেম বলা চলে না। এ আসক্তি রূপবতীর রূপভোগ-লালসা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ক্ষুধাতুরের অন্নের প্রতি ক্ষুধার মত, কামাতুরের অসংযত চিত্তের চাঞ্চল্যকে প্রেম বলা চলে না।

প্রেম শরচ্চন্দ্র-কিরণবৎ নির্ম্মল, সুখস্পর্শ ও প্রিয়দর্শন। রূপ-মোহ (কাম) নৈদাঘ সূর্য্যকরবৎ তীক্ষ্ণ, খরস্পর্শ ও রুক্ষদর্শন। প্রেম নিত্য নব নব ভাবে আপনাকে প্রকাশ করে, নূতন নূতন আকারে বিচিত্রতাময় হইয়া দেখা দেয়। যতই দিন

যায়, প্রেম ক্রমশঃ "নিবিড়বন্ধ" পরিচয়ে গাঢ় ও ঘনীভূত হইয়া অচ্ছেদ্য সুখকর বন্দনে পরিণত হয়। আপনার সুখ অপেক্ষা প্রেমাস্পদের সুখই অধিকতর কাঙ্ক্ষনীয় বস্তু—এই ত্যাগের ভাবটি থাকে বলিয়াই প্রেম অমৃত। মোহ বা কামে ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সংস্পর্শজনিত সুখই একমাত্র কাম্য হয় বলিয়া উহা গরল। প্রেম এবং রূপ-মোহের (কাম) সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে আপাততঃ রূপ-মোহই জয়ী হয়। মোহের দুষ্প্রাপ্য বস্তুর উপরই অত্যাধিক আকর্ষণ। এক্ষেত্রে কুন্দের উপর নগেন্দ্রের আসক্তিই (যাহার নাম রূপ-মোহ) জয়ী হইল।

সূক্ষ্ম চিন্তার দিক্ দিয়া বিচার করিয়া, কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রের আসক্তিকেই রূপমোহ বা রূপবতীর রূপ-ভোগলালসা—এই নাম দেওয়া হইল। তবে সাধারণতঃ ইহাকে অনুরাগ, প্রণয় বা ভালবাসাই বলা হইয়া থাকে, এই মাত্র।

কুন্দের প্রতি এজন্য সূর্য্যমুখীর মনের মধ্যে একটি বিরাগ জন্মিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া ব্যভিচারিণী-বোধে তাহাকে গৃহতাড়িত করার ব্যাপারে যে ঐ বিরাগ সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, এমন কথা আমরা বলিতে পারি না। তবে ঐ বিরাগই সূর্য্যমুখীকে তাহার অজ্ঞাতে বিবেচনামূলক বিচার করিতে দেয় নাই—ইহা বলা যাইতে পারে।

নগেন্দ্র সূর্য্যমুখী-কর্ত্তৃক কুন্দের বিতাড়িত হওয়ার সংবাদ শুনিবামাত্র, অতিকষ্টে নিরুদ্ধ মোহ তাহাকে সত্য সত্যই এইবার আচ্ছন্ন এবং উন্মত্ত করিয়া দিল। মোহের প্রভাব যখন চরমে উঠে, তখন বিচার বিবেচনা থাকে না; বাক্যে কার্য্যে কোন

বন্ধনই দেখা যায় না। মোহ, দ্রুত বা ধীরে, অন্ধতা ও উন্মত্ততা আনিয়া দেয় ; মানবকে আচ্ছন্ন এবং আবিষ্ট করিয়া তমোগুণের বৃদ্ধি করে। মোহের প্রভাবে নগেন্দ্র তদ্গতপ্রাণা সূর্য্যমুখীর মত পত্নীকেও কহিল—

"আমি যথার্থ তোমার নিকট বিশ্বাসহন্তা। যথার্থই আমি তোমাকে ভুলিয়া কুন্দনন্দিনীতে * * আমি পাপাত্মা—আমার চিত্ত বশ হইল না।"

যাহাদের প্রকৃতি সৎ, তাহারা নিজেদের দোষ বুঝিতেও পারে, স্বীকারও পায়। অসৎপ্রকৃতি বা অন্যাসক্ত ব্যক্তি মর্ম্ম-বেদনার সহিত পত্নীর নিকট এ প্রকারে দোষ স্বীকার করিতে পারে না। শেষে, নগেন্দ্র অনেকদিন ধরিয়া—যাহা বলি বলি করিয়া লজ্জা ও সঙ্কোচে বলিতে পারিতেছিল না, আজ মনের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে—বলিল আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। মরিব না—কিন্তু দেশান্তরে যাইব। বাড়ী ঘর সংসারে আর সুখ নাই। তোমাতে আর সুখ নাই। * * তুমি এ গৃহে গৃহিণী থাক। * * যদি কুন্দনন্দিনীকে ভুলিতে পারি, তবে আবার আসিব। নচেৎ তোমার সঙ্গে এই সাক্ষাৎ।"

নগেন্দ্রের অনুরাগ দিনে দিনে তিলে তিলে সঞ্জাত ও বর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমান লালসাময় মোহে পরিণত হইয়াছে। বহুদিনের চেষ্টায় চিত্তবেগ নিরুদ্ধ করিতে না পারিয়াই, এই সংসারত্যাগের দৃঢ় সংকল্প জন্মিয়াছে। পতিপ্রাণা সতি সূর্য্যমুখী পতির সুখ সম্ভোগের জন্য আপনার জীবনের সুখসন্তোষ বলি দেওয়া স্থির করিল। আত্মত্যাগমূলক প্রেমের ধর্ম্মই এই। অভাগী

কুন্দও একদিন, নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখীর মঙ্গলের জন্য তাহাদের জীবন-পথের কণ্টক হইয়া থাকিতে চাহে না বলিয়া আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতে গিয়াছিল। এ প্রেমও আত্মত্যাগমূলক। তবে নগেন্দ্র-লাভ নিশ্চিত জানিয়া কুন্দ আত্মহত্যা করিতে যায় নাই,—সেজন্য সূর্য্যমুখীর অপেক্ষা কুন্দের প্রেমের মর্য্যাদা অবশ্য অল্প।

কুন্দ ফিরিল। অভাগী তাহার নয়নের উৎসব-স্বরূপ নগেন্দ্রকে দেখিতে পাওয়ার বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া ফিরিল। হীরার বাটীতে কয়দিন থাকিয়া সে বুঝিল, দত্তবাটীতে না থাকিলে সে বাঁচিবে না। আত্মবিলোপী প্রেমের কাছে কুন্দের মান অপমান, আত্মাদর বা আত্মমর্য্যাদা সবই লোপ পাইল।

সূর্য্যমুখী রহস্য করিয়া বলিয়াছিল—"আর যদি নিজে বিবাহ করিবার ইচ্ছা থাকে ত বল, আমি বরণডালা সাজাইতে বসি।" সত্যই সূর্য্যমুখী বরণডালা সাজাইয়া স্বামীর সহিত কুন্দের বিবাহ দেওয়াইয়াছিল। সূর্য্যমুখীর এ বক্ষোরক্তদানে দেবতার পূজা। জীবনে সুখসন্তোষ বলি দিয়া পতির এ তৃপ্তিবিধান। স্বামীর সুখেই সুখ, এইরূপ আত্ম-বিসর্জ্জনের দিক্ দিয়া দেখিলে সূর্য্যমুখী সুখিনী হইয়াছিল, কিন্তু হৃদয়ের দিক্ দিয়া তাহার অন্তরের অন্তর যে হাহাকার করিতেছিল, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। নহিলে নগেন্দ্র যখন বৈঠকখানায় বসিয়া কুন্দনন্দিনী, কুন্দ আমার, কুন্দ আমার স্ত্রী, কুন্দ, সে আমার, এইরূপ সুখস্বপ্ন দেখিতেছিল, সূর্য্যমুখী তখন রুদ্ধ গবাক্ষসন্নিধানে অধোবদনে বসিয়া সারারাত্রি ভাবিবে কেন ? কমলমণির কোলে মাথা লুকাইয়া নীরবে গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিবেইবা কেন ? নব-দেবদারুতুল্য দেহতরুই বা দুইদিনে

ধনুকের মত ভাঙ্গিয়া পড়িবে কেন? সূর্য্যমুখী স্বামীর সুখ-সন্তোষের জন্য বিবাহ দিয়াছে, আর বিবাহ দিয়া স্বামীর মুখে হাসি ফুটিতে দেখিয়া তৃপ্তিলাভও করিয়াছে, তবে আবার সে এক দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া গৃহত্যাগ করিল কেন? ইহার উত্তর সূর্য্যমুখী নিজেই দিয়া গিয়াছে—"আমাকে পায়ে ঠেলিয়াছেন বলিয়াই তাঁর এত আহ্লাদ।" নগেন্দ্রকে বিলাইয়া দেওয়া অপেক্ষা আপনার উপর এই অবহেলাই সূর্য্যমুখীর প্রাণে বিষম ব্যথা জন্মাইয়াছে। ইহা ভালবাসার দুর্জ্জয় অভিমান। নারীত্ব এবং প্রেমের উপর প্রচণ্ড আঘাত। তৎফলেই গৃহত্যাগ।

হায় অভিমানিনি নারি! আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা যতই দেখাও, চিত্তবলের যতই গৌরব কর, তথাপি ভুলিও না যে, তুমি নারী, রক্তমাংসময়-হৃদয়সমন্বিত মর্ত্ত্যের মানবী। সীতা ও সুভদ্রা হইতে আয়েষা ও প্রতাপ পর্য্যন্ত সকলেই একদিন বুঝিতে পারিয়াছিল,—তাহারা মর্ত্ত্যের জীব।

প্রেমের অমর্য্যাদা, নগেন্দ্রের অবহেলা ও দুর্জ্জয় অভিমানবেগ সহ্য করিতে না পারিয়াই সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিল। নিদারুণ বেদনায় অধীরা এবং মুহ্যমানা হইয়াই অবলা তাই পলাইল। ইহা অবিবেকান্ধতা, স্ত্রীসুলভ দুর্ব্বলতা ও দুর্জ্জয়াভিমানোত্থিত মূঢ়তা মাত্র।

নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীর সুখস্বপ্নে বিভোর, সেই সময়েই সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগ-সংবাদ শুনিল। কুন্দের প্রতি সে মোহ যাদুকরের ইন্দ্রজালের মত সহসা ছুটিয়া গেল। যতদিন সূর্য্যমুখী ছিল, ততদিন সূর্য্যমুখীর অভাব ছিলনা। "যতদিন সূর্য্যদেব অনাচ্ছন্ন

থাকেন, ততক্ষণ তাহার কিরণে সন্তাপিত হই, মেঘ ভাল লাগে, কিন্তু সূর্য্য অস্ত গেলে বুঝিতে পারি, সূর্য্যদেবই সংসারের চক্ষু, সূর্য বিনা সংসার আঁধার।" কুন্দের সহিত মেঘের তুলনা, সূর্য্য মুখীর সহিত সূর্য্যের তুলনা। আমাদের কিন্তু মনে হয়, কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রের আসক্তিই মেঘের সহিত, সূর্য্যমুখীর প্রতি নগেন্দ্রের প্রেমই সূর্য্যের সহিত উপমিত। মেঘ ক্ষণস্থায়ী, ধূসরবর্ণ। সূর্য্য চিরস্থায়ী, হিরণ্যবর্ণ।

নগেন্দ্রনাথ আবাল্য সুখে লালিত পালিত। দুঃখ কাহাকে বলে জানে না, বিপদে কখন পড়ে নাই। কাজেই দুঃখে যে ধৈর্য্য, বিপদে যে সহিষ্ণুতা জন্মে, তাহা তাহার হয় নাই। দুঃখ শোক এবং বিপদের মধ্যে না পড়িলে মানুষের প্রকৃত শিক্ষা হয় না। নিরবচ্ছিন্ন সুখে কখন প্রকৃত মানুষ গড়িয়া উঠে না। তাই নগেন্দ্র কুন্দের মোহে দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছিল; আর এখন সূর্য্যমুখীর অভাবেও আত্মহারা হইয়া একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। এমন কি, কুন্দকেই সূর্য্যমুখীর পলাইবার হেতু ভাবিয়া তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া অনুযোগ করিল—"তোমারই জন্য সূর্য্যমুখী আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইল। * * বানরের গলায় মুক্তার মালা সহিবে কেন? লোহার শিকলই ভাল।" এই লোহার শিকলের জন্যই না নগেন্দ্র একদিন মুক্তার মালাকে বলিয়াছিল,—তোমাতে আমার সুখ নাই?"

নগেন্দ্রনাথ জানিল, সূর্য্যমুখীর গৃহদাহে মৃত্যু হইয়াছে। সূর্য্যমুখী যখন গৃহত্যাগ করিয়া যায়, তখনও আশা ছিল, হয়ত সে

ফিরিয়া আসিবে। মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া নগেন্দ্রনাথ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিল, সবই ফুরাইল। আশা পর্য্যন্ত যখন নাই, তখন আর থাকিল কি? এদিকে কুন্দ নগেন্দ্রনাথকে পাইয়া ভাবিয়াছিল— "এ সুখের সীমা নাই।" আর এখন নগেন্দ্রনাথের নিকট হইতে মর্ম্মবেদনা পাইয়া বুঝিতে পারিল, "সকল সুখের সীমা আছে।"

সূর্য্যমুখী ফিরিয়া আসিল। এই অপ্রত্যাশিত সূর্য্যমুখীলাভে নগেন্দ্রনাথ যে কিরূপ সুখী হইল—তাহা বর্ণনার অতীত। নগেন্দ্রনাথের মনোবেদনা প্রত্যক্ষ করিয়া এবং তাহার মূর্চ্ছা-দর্শনেই সূর্য্যমুখী বুঝিয়াছে—সে-ই এখন পতির হৃদয়রাজ্যের সম্রাজ্ঞী। কুন্দ এখন কৃপা এবং সহানুভূতিরই পাত্রী, ছোট ভগ্নীর মত স্নেহের অধিকারিণী। এ অবস্থায় কুন্দের প্রতি আর তাহার কোনওরূপ সূক্ষ্ম ঈর্ষার ভাব থাকিতে পারে না। সূর্য্যমুখী মান অভিমান যতই ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসুক, স্বামীকে কুন্দগতপ্রাণ দেখিলে কখনই সে হাসিয়া বলিতে পারিত না যে, "চল কুন্দকে দেখিয়া আসি"।

কুন্দ বিষ খাইয়া এখন মৃত্যুপথের যাত্রী। নগেন্দ্রনাথ আসিয়া কুন্দের সেই মৃত্যুচ্ছায়ান্ধকার-ম্লান মুখের পানে চাহিয়া অশ্রু-সংবরণ করিতে পারিল না। নগেন্দ্রনাথ অধোবদনে—জানুর উপর ললাট রক্ষা করিয়া শুনিয়া গেল—"তোমাকে দেখিয়া আমার তৃপ্তি হয় না। আমি মরিতাম না। * * তোমাকে দেখিলে আমার মরিতে ইচ্ছা করে না। * * আমি তোমাকে দেবতা বলিয়া জানিতাম। * * আমার সাধ মিটিল না।" শোকে দুঃখে, লজ্জা বেদনায় আর কৃতকর্ম্মের অনুতাপে নগেন্দ্র-

নাথের হৃদয়টি বিদীর্ণপ্রায় হইল। নিজেরই অসংযম এবং চিত্ত-দৌর্ব্বল্যের জন্য কুন্দ এই নবীন যৌবনে—এই অপরিতৃপ্ত জীবনে বড় সাধের প্রাণ ত্যাগ করিয়া গেল।

নগেন্দ্রনাথের রোপিত বিষবৃক্ষের ফল ফলিল। সেই বিষ ফলটি খাইয়া তাহার জীবনটি এক প্রকার নূতন "ট্র্যাজিডি" হইয়া পড়িল। কুন্দের আধিক্লিষ্ট মুখের বিদ্যুন্নিন্দিত হাসি নগেন্দ্রনাথ প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত ভুলিতে পারে নাই। অর্দ্ধজাগ্রত তাহার চক্ষুর উপর কুন্দের স্মৃতি, কি দিবা, কি রাত্রি, দুঃস্বপ্নের মত সততই জাগরূক ছিল। কুন্দের ছায়ামূর্ত্তি নগেন্দ্রনাথ ও সূর্য্যমুখীর মিলনের মধ্যস্থলে চিরদিনের মত ব্যবধানরূপে রহিয়া গেল।

দলনী।

আজি আমরা একটি সতীনারীর চরিত্র-সমালোচনা পাঠক-বর্গকে উপহার দিতেছি। ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসের একটি ক্ষুদ্র চিত্র। আকারে অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু স্ফটিকের মতই স্বচ্ছ, হীরকখণ্ডের মতই মহামূল্য আর তুলসীমঞ্জরীর মত পবিত্র। একাধারে রাজোদ্যানের গোলাপ, দেবপূজার শতদল। নবাবদের ভোগবিলাসময় অন্তঃপুরে—এমন আদর্শ চরিত্র কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শতনারী-ভোগতৃপ্ত, দৃঢ়চিত্ত নবাব মীরকাসেমের চিত্তদলনী বলিয়া "দলনী।" অথবা নবীন যৌবনে এমন সুন্দর কুসুমটী দলিত হইয়া গেল বলিয়াই "দলনী।" দলনী নবাব মীরকাসেমের প্রণয়িনী, অর্দ্ধাঙ্গিনী ও ধর্ম্মপত্নী। ত্যাগে দেবী, ভোগে মানবী, সরলতায় বালিকা, আকারে কিশোরী, ভালবাসায় তরুণী—এমন রমণী ধরাতলে অল্পই জন্মলাভ করে। নবাবের লৌহ-কপাটবৎ সুদৃঢ় বক্ষে এই ক্ষুদ্রাকৃতি দলনী মহীরুহ-অঙ্গে সংলগ্না লতার মতই শোভা পায়। এ যেন বিন্ধ্যাগাত্রে বিশীর্ণা রেবা, এ যেন মহাহ্রদ-বক্ষে ক্ষুদ্র দীপশিখা। এ রেবা সমস্ত বিন্ধ্যগাত্র নিয়তই সরস ও সিক্ত করিয়া তুলিয়াছে, এ দীপশিখা সমগ্র হ্রদ-বক্ষ সারারাত্রি ধরিয়াই উজ্জ্বল ও শোভিত করিয়া রাখিয়াছে।

দলনী যখন ক্ষুদ্রমস্তকে বিলম্বিত নিবিড়কুঞ্চিত কেশরাশি

এলাইয়া, সুগঠিত চম্পকসুকুমার অঙ্গের দোলনে রূপের ঢেউ খেলাইয়া, ক্ষুদ্র বীণাটিতে মৃদুমুগ্ধ ঝঙ্কার তুলিত,—ধীরে ধীরে কাঁপিয়া থামিয়া বিশিষ্ট শ্রোতার অতর্কিত আগমন-ভয়েই কণ্ঠস্বর চাপিয়া প্রেমগীতি গাহিত—কিম্বা প্রণয়ীর পার্শ্বে "মেঘাচ্ছন্ন স্থল-কমলিনীর ন্যায় মুখ ফোটে ফোটে ফুটাইতে না পারিয়া বীণা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিত" ; তখন সে প্রেমের অর্দ্ধস্ফুট ফুল।

আবার যখন দলনী "যদি আমার বধের আজ্ঞা দেন, তথাপি সেই পতির কাছে আমি যাইতে চাহি" এই সুদৃঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছে—ভূমি-আসনে বসিয়া ঊর্দ্ধমুখে, ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে, গলদশ্রু-লোচনে রাজরাজেশ্বর প্রভুর অনুমতিতে বিষভোজনে কুণ্ঠিতা হয় নাই—তখন সে প্রেমের পরিপক্ব ফল। যেমন প্রেমিকা তেমনই সেবিকা। স্নেহ, প্রেম, ভক্তি, সেবা এবং ত্যাগের জীবন্ত বিগ্রহ। ইহার তুলনা নাই।

দলনীর এই বিষ-ভোজন আত্মোৎসর্গমূলক প্রণয়ের জ্বলন্ত নিদর্শন। সতীর ইহা পতি-আজ্ঞাপালন, দাসীর প্রভুপার্শ্বে আত্ম-সমর্পণ, শিষ্যার গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব নিবেদন। এ মৃত্যু আত্মহত্যা নহে, আত্মবলি। চিত্তের অপ্রাকৃতিক উত্তেজনায় বিকৃতমস্তিষ্কা হইয়া, দুর্ব্বলচিত্তা নারী অনেক সময়ে আত্মহত্যা করিয়া বসে। দলনী কোনরূপ উত্তেজনায় বিকৃতমস্তিষ্কা হয় নাই। চিত্তের দৌর্ব্বল্য দূরে থাক্, বরং এই আজ্ঞাপালনে চিত্তের অসামান্য দৃঢ়তাই তাহার প্রকাশ পাইয়াছে।

দলনী "বিনয়ার্জ্জবাদিযুক্তা" পতিপ্রেমমুগ্ধা "মুগ্ধা"-জাতীয়া নারী। "মুগ্ধা"-জাতীয়া নারী বলিয়াই নবাবের বিলাসময় অন্তঃ-

পুরে বাস করিয়াও কোনরূপ প্রগল্ভতা, কোনরূপ চাতুর্য্য সে শিক্ষা করে নাই। গীত গাহিতে বলিলে লজ্জাভয়ে মরমে মরিয়া যাওয়া—আদরে সোহাগে আত্মহারা ও তন্ময়তায় বিলীন হওয়া—পতির অণুমাত্র বিপদাশঙ্কায় স্বয়ং বিপদের মুখে ঝাঁপাইয়া পড়া—মীরকাসেমের মহিষী নবাব-অন্তঃপুরের বেগমের পক্ষে বস্তুতই বিস্ময়কর। নবনীর মত কোমল উপাদানের যে কোন অবস্থাতেই হউক প্রস্তরকঠিন বস্তুতে পরিণতি বিস্ময়করই হইয়া থাকে।

দলনীর এই আত্মবিস্মৃতিময়, এই পরার্থতাময় প্রেম অনাঘ্রাত পুষ্পের মত, "অনাস্বাদিতরস" মধুর মত সুন্দর এবং মধুর। পতিকে সে প্রণয়ী ভাবিয়া যেমন ভালবাসিত, বাদসাহের বাদশাহ ভাবিয়া সম্ভ্রমও করিত। আপনাকে বিলীন করিয়া আপনার স্বতন্ত্র সত্তা যেমন ভুলিয়া যাইত, তেমনই আপনাকে বাঁদীর বাঁদী ও মনে করিয়া যেন শতহস্তযোজন দূরে থাকিয়াই শুধু চাহিয়া থাকিত।

তার সেই প্রিয়তম-আগমন আশায় আকুলিবিকুলি করা—গুলেস্তা পড়িতে আরম্ভ করিয়া অকস্মাৎ সেই বহি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া—সামান্য একটু শব্দে চমকিয়া উঠিয়া দ্বারের দিকে সতৃষ্ণনেত্রে চাহিয়া থাকা—স্বামী আসিতেছেন শুনিবামাত্র অঙ্গের দুরু দুরু কম্প—বক্ষের তালে তালে নৃত্য—ধমনীর নাচিয়া নাচিয়া—দ্রুত বিলম্বিত গতির সহিত বীণার তারে বেসুর রাগিণী বাজা—আত্মবিস্মৃতিময় প্রেমের অবস্থা। আবার রাত্রিকালে ছদ্মবেশে দাসী "কুলসমকে" মাত্র সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুর ত্যাগ করা—সেনাধ্যক্ষ, পরপুরুষরূপে পরিচিত "গুরগণ খাঁর" শিবিরে একা-

কিনী সাক্ষাৎ করা—পতিআজ্ঞা পালনের জন্য নিজহাতে বিষ-ভোজন করিয়া প্রাণ বলি দেওয়া—পরার্থতাময় প্রেমের পরিচায়ক।

দলনী বালিকাকৃতি, অতি কোমলপ্রকৃতি মুগ্ধা রমণী মাত্র। যুদ্ধে পতির অশুভ সম্ভাবনা করিয়াই হারেম ছাড়িয়া আঁধারময় রাজপথে দাঁড়াইতে ইতস্ততঃ করে নাই; কিসে পতির মঙ্গল হইবে, এই ভাবনায় ব্যাকুলা হইয়াই গুরগণ খাঁর কাছে কাঁদিতে কাঁদিতে অনুরোধ করিতেও কুণ্ঠিতা হয় নাই। একে বালিকা-বুদ্ধি—তায় স্বভাবসরলা—প্রেমবিভোরা—বিপদাশঙ্কায় জ্ঞানহারা—তাই সে কুলকন্যা-অনুচিত অসমসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিল। ইহাতে এমন কিছু দোষ ঘটিতে পারে, তাহা সে ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই। সংসারে চলিবার পথটি যে এমন কঙ্করময়, উপলবিষম বা হিংস্রজন্তু-সমাকীর্ণ, সে ধারণাই তাহার জন্মে নাই। পতিপুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়াই সীতারামের সরল-বুদ্ধি রমা অন্তঃপুরে গঙ্গারামকে ডাকিয়া আনার মধ্যে কোন দোষ দেখে নাই। অন্যের কথা কি বলিব, স্বয়ং সীতাদেবীও পতির বিপদ্ নিশ্চয় করিয়াই লক্ষ্মণকে যাহা না বলিবার, সেই অকথ্য ভাষাপর্য্যন্ত প্রয়োগেও সঙ্কুচিতা হয় নাই।

ভ্রাতার সহিত ভগিনী সাক্ষাৎ করিতে চলিয়াছে—ইহাতে ধর্ম্মের দিক্ দিয়া দোষের কথা কিছুই নাই, তথাপি দলনীর এই কার্য্য, কি লোকচক্ষুতে, কি সূক্ষ্মবিচারে, উভয়তই দূষণীয়;—প্রথমতঃ, গুরগণ খাঁ যে দলনীর ভ্রাতা—ইহা কেহ, এমন কি স্বয়ং নবাব পর্য্যন্ত অনবগত। দ্বিতীয়তঃ, নবাবমহিষীর পক্ষে

রাত্রিকালে ছদ্মবেশে সেনাধ্যক্ষের শিবিরে গমন। যে গোপন সাক্ষাতের কথা লোকে শুনিলে অভিসারিকার কুৎসিত অভিসার বলিয়া মনে করিবে—তাহা দূষণীয় না বলিয়া আর কি বলিব? এতবড় বুকের পাটা বা এতবড় দুঃসাহস যে, কুলনারীর পক্ষে সম্ভব—ইহা যদি কেহ বিশ্বাস না করে, তজ্জন্য তাহাকে দোষ দেওয়া চলে না। স্বতঃশুদ্ধা এবং স্বভাব-সরলার বালিকাবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত বলিয়া অন্যায় কার্য্য ত ন্যায়কার্য্য হইয়া যাইবে না। অগ্নিতে হাত দিলে শিশু বলিয়া তাহাকে দগ্ধ করিতে অগ্নি কখন বিরত হয় না।

দলনীর মনটি নবনীর মত কোমল, গোমুখী-স্রোতের মত পবিত্র, চন্দ্রকিরণের মত উদার। তাহার সেই মনে, কাহারও উপর ক্রোধ বা ঘৃণার ভাব জন্মিবার কথা নহে। ইংরাজের উপর তাহার যে ক্রোধ বা বিরক্তির ভাব ফুটিতে দেখা গিয়াছে—তাহা তাহার নিজস্ব নহে। মীরকাসেম তাহার স্বামী, প্রভু, আর সে দাসী মাত্র—তজ্জন্যই স্বামীর মনোভাব তাহার হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। মীরকাসেম মনে মনে ইংরাজকে ভয় করিত, দলনীও তাই যুদ্ধ বাধিবার নামে ভয়েই এমত অস্থির হইয়া উঠিত। আর সে ভয়, পতিরই জন্য—নিজ প্রাণের মায়ার জন্য নহে। সে বৃত্রসংহারের ইন্দুবালার ন্যায় কিছুমাত্র শত্রুপক্ষ-পাতিনী ছিল না। শত্রুমিত্রে সমভাব আনাইয়া দেয়—এমন বিশ্বজনীন করুণা লইয়া সে পৃথিবীতে আইসে নাই।

পতির প্রতি বা পতির ভালবাসার প্রতি দলনীর বিশ্বাস অপরিসীম। মহম্মদ তকির হস্তে স্বামীর নামাঙ্কিত পরোয়ানা

দেখিয়া তাহার মনে হইয়াছিল,—"স্বামী আমার স্নেহময়, এরূপ আজ্ঞা তিনি কখনই দিতে পারেন না। এ জাল পরোয়ানা।" তারপর যখন শুনিল,—স্বামীর মনের মধ্যে গৃহত্যাগপূর্ব্বক ব্যভিচারিণী এই বিশ্বাস উৎপাদন করিয়াই এ পরোয়ানায় স্বাক্ষর করান হইয়াছে,—তখন বুঝিল, এ পরোয়ানা জাল নহে।

অভাগী তখন স্বামীর স্বাক্ষরটির পানে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। জীবনের আশা তাহার ফুরাইয়াছে, প্রভুর আজ্ঞা পালন করিয়া তাঁহার দত্ত দণ্ড গ্রহণ করাই দাসীর কর্ত্তব্য বলিয়া সে স্থির করিল। এত বড় দুর্ভাগ্যের মধ্যেও দলনীর ইহাই সৌভাগ্য যে—দুইদিন পরে প্রিয়তমের পরাজয়, রাজ্যচ্যুতি, ভগ্নহৃদয়ে পলায়ন আর শেষে নিরাশায় নিধনপ্রাপ্তি আর তাহাকে দেখিতে হইল না। পতির অগ্রেই স্বর্গভ্রষ্টা দেবী দেহত্যাগ করিয়া গেল।

সতী নারী ফলভারনতা লতার মত যতই বিনতা, শতদল কলিকার মত যতই কোমলা হউক, সতীত্বের উপর কটাক্ষ করিলে সেই সতী নারীই আহতা সর্পীর মত মাথা খাড়া দিয়া উঠে, অগ্নিশিখাবৎ জ্বলিতে থাকে। তাই তাহার মুখে শুনিলাম —"ভুলিয়া যাইও না, মীরকাসেম আমার জীবনে মরণে প্রভু।"

দলনীর ইহা আঘাতপ্রাপ্তি-জনিত সাময়িক উত্তেজনা মাত্র। উত্তেজনার পরই স্বাভাবিক অবস্থা পাওয়া কিম্বা অবসন্ন হইয়া পড়া, কোমলপ্রকৃতি নারীর প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম্ম। নতুবা "দ্বিতীয় নুরজাহান হইবে" এই কথা (ভ্রাতার মুখে শুনিতে হইতেছে বলিয়া অবশ্য) শুনিয়া গলদশ্রুলোচনে সে কাঁদিতে বসিবে কেন? অনুনয়ের পর ক্রোধ, (উত্তেজনা ও ক্রোধেরই ফল) ক্রোধের পর

রোদন, রোদনের পর অবসন্নতা সবই দেখা গেল। দলনীর অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না।

অন্তঃপুর-দ্বার রুদ্ধ—ফিরিবার উপায় নাই; ভবিষ্যৎ ঘোর আঁধারময় এবং বিপৎপূর্ণ—এ সময়েও দলনী দৃঢ়তার সহিত বলিল—"এখানে দাঁড়াইয়া ধরা পড়িব। * * * আমি নিরপরাধিনী।" ইহা নিষ্পাপ অন্তঃকরণের অভিব্যক্তি, ছলকলা-শূন্য স্বভাবের কথা। ইহাই সতীর অন্তর্নিহিত সতীত্বের তেজ।

সতীর এই অন্তর্নিহিত তেজই কার্য্যক্ষেত্রে নানা দিক্ দিয়া নানা-ভাবে ফুটিতে দেখা যায়। জনকদুহিতা সীতা যে, অভিজ্ঞান-চিহ্ন দেখিয়াও হনুমানের সহিত স্বামীর নিকট যাইতে চাহে নাই—সীতারামের রমা যে, সহস্রলোক-সম্মুখে দাঁড়াইয়া আপনার নির্দ্দোষিতার কাহিনী বলিয়া যাইতে কুণ্ঠিতা হয় নাই—প্রকৃতি-দুহিতা কপালকুণ্ডলা যে, "আমি অবিশ্বাসিনী কিনা স্বচক্ষে দেখিয়া যাও" নবকুমারকে এমন কথা পর্য্যন্ত বলিতে পারিয়াছে—এ সমস্তই সেই একই তেজের বিভিন্ন বিকাশ মাত্র।

আমাদের শাস্ত্রে বলে,—ভগবতী সতীর অংশেই সতীনারীর জন্ম। কোমলা সতীনারী লম্পটকর্ত্তৃক আক্রান্তা হইয়া কখন কখন, শক্তির অংশে জন্ম বলিয়াই অকস্মাৎ অসীম বলশালিনী ও অসমসাহসিনী হইয়া উঠে; ক্ষুদ্রকায়া দলনীও তাই তকির মত বলবান্ পুরুষকে পদাঘাত করিয়া কুক্কুরের মত তাড়াইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিল। অনুরাগে যাহারা ঢলিয়া পড়ে, লজ্জায় নুইয়া যায়, অভিমানে শয্যা গ্রহণ করে—সেই মুগ্ধা নারীকেও মনের বলে কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষিপ্তা ব্যাঘ্রীর মত ভয়ঙ্করী

দেখা দায়। এমনও শুনা গিয়াছে,—বঙ্গনারী খাঁড়া ধরিয়া রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিতে আপনার সম্মান রক্ষা করিয়াছে।

সতী-অঙ্গ স্পর্শ করিলে আয়ুক্ষয় হয়—ইহা আর্য্যঋষিগণের উক্তি। পাপিষ্ঠ তকিও সতীর অপমান করিয়া তাহার ফল সগু সগু হাতে হাতেই পাইয়া গেল। অপমান এবং মৃত্যু তাহার ঐহিক ফল। পারলৌকিক ফল নরকভোগ; মৃত্যুর পর তাহা ব্যবস্থিত হইবে। আজিকালিকার কোন কোন ঐতিহাসিক বলিয়াছেন,—মহম্মদ তকি ঘৃণিত চরিত্রের লোক ছিল না। সে বিচার ঐতিহাসিকের উপর দিয়া আমরা উপন্যাসে যেমন পাইয়াছি, সেই মতই আলোচনা করিলাম।

পতির আজ্ঞায় দলনীর স্বহস্তে বিষভোজন-দৃশ্যটি বড় করুণ, বড় মর্ম্মস্পর্শী। "আসনে উর্দ্ধমুখে, উর্দ্ধদৃষ্টিতে জোড়করে বসিয়া আছে; বিস্ফারিত পদ্মপলাশ চক্ষু হইতে জলধারা বক্ষে আসিয়া পড়িতেছে।" সতী-সাধ্বী বিষপানের অসহ্য জ্বালা নীরবে সহ্য করিয়া অগ্নিবেষ্টিতা সহমরণযাত্রী বিধবার মত হাসিতে হাসিতে দেহত্যাগ করিল।

মৃত্যুকালে তাহার এই দুঃখ রহিয়া গেল যে, প্রভুর সম্মুখে বসিয়া সে প্রভুর আজ্ঞা পালন করিতে পাইল না।

নবাব মীরকাসেম হঠকারী অবিবেচকের ন্যায় অবশ্য দুষ্ট লোক কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া যে কার্য্য করিল, ফলও তার সঙ্গে সঙ্গেই ফলিল। দলনীর ন্যায় রাজলক্ষ্মীও নবাবকে জন্মের মত ছাড়িয়া গেল। দলনীর মরণের পর "কুলসমের" নিকট সমস্ত ঘটনা শুনিয়া নবাব মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিল—নিজদোষে কি রত্নই

জলাঞ্জলি দিয়াছে। সুপ্তপ্রায় প্রণয় জাগিয়া উঠিল, নবাবের চক্ষু ফাটিয়া তখন জলধারা গড়াইয়া পড়িল। ওথেলোর বুকফাটা ক্রন্দন আর নবাবের নীরব ক্রন্দন—দুই সমান হৃদয়-মর্ম্মচ্ছেদী।

আত্মহত্যাকারীর গতি অন্ধতামিস্র নরকে। সহমরণ আত্মত্যাগমূলক বলিয়াই তাহার ফল স্বর্গলোক। সহমরণ—আত্মহত্যা নহে। দলনীর এই প্রাণত্যাগ পতির আজ্ঞাপালন মাত্র। আত্মত্যাগমূলক বলিয়া সহমরণের মত ইহা স্বর্গগমনেরই কারণ।

দলনী প্রণয়ের পারিজাত, নিরভিমানিতার আদর্শ। ভোগে মানবী, ত্যাগে দেবী। আমরা স্পষ্ট চক্ষুতে দেখিতে পাইতেছি,—দলনী স্বর্গে সতী-কুঞ্জে যাইয়া স্বর্গীয় শান্তিলাভ করিয়াই কৃতার্থা হইয়াছে।

সম্পূর্ণ

বঙ্কিমচিত্র সম্বন্ধে মতামত।

মানসী মর্ম্মবাণী—গ্রন্থকার ভ্রমর, রোহিনী ও গোবিন্দলাল প্রভৃতি নায়ক নায়িকার চিত্র সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তুলনামূলক বিচারে তাঁহার কৃতিত্ব বিশেষভাবেই লক্ষিত হয়।

কালীকলম—নায়িকাগণের নামের অর্থ হইতে তাঁহাদের চরিত্র বিশ্লেষণের যে পদ্ধতি শাস্ত্রী মহাশয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সুন্দর হইয়াছে।

হিতবাদী—(৩১শে ভাদ্র ১৩৩৪) তিনি (গ্রন্থকার) বঙ্কিম বাবুর সৃষ্ট নায়ক নায়িকাগণের চরিত্র বিশ্লেষণে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, লেখকের বিচার বুদ্ধির ও ভাবুকতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

বাঙ্গলার কথা—বিপিন বাবু (বিপিনচন্দ্র পাল) লিখিয়াছেন—"পণ্ডিত মহাশয়ের বঙ্কিম চিত্রে বঙ্কিমের অনেকগুলি রসসৃষ্টি বেশ সুন্দর হইয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রবাসী। (আশ্বিন) তাঁহার ভাষা সরল, প্রাঞ্জল ও মধুর। চরিত্র ব্যাখ্যা অতিশয় স্বাভাবিক, চিত্তাকর্ষক ও সংক্ষিপ্ত। আমরা বহুদিন এমন সুন্দর বঙ্কিমপরিচয় পাঠ করি নাই। বাঙ্গলা সাহিত্যে ইহা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে।

বসুমতী। (দৈনিক—২২শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার) * * বঙ্কিমচিত্রেও তিনি কবির তুলিতে অঙ্কিত করিয়াছেন। * ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল। * বাঙ্গলা ভাষায় এরূপ গ্রন্থ বড়ই বিরল। গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে ছত্রে ছত্রে পত্রে পত্রে বঙ্কিমচন্দ্রকে স্মরণ হয়। অথচ কোথায়ও বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যর্থ অনুকরণ নাহ।

আত্মশক্তি। (২৪শে ভাদ্র) * * আলোচনায় পাণ্ডিত্য আছে।

আনন্দ বাজার। ৩রা আশ্বিন) * * * মনীষী শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় এই সুন্দর গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখিয়া যোগ্যতা ও গুণের সমাদর করিয়াছেন।

অবতার। (১৭ই ভাদ্র) ইঁহার ভাষা মধুস্রাবিনী। তিনি (বিপিন পাল) বলিয়াছেন "রসসৃষ্টি সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।" আমরাও একমত। আরও বলি, সমালোচনাও যে একখানি স্বতন্ত্র মনোরম পুস্তক হইয়া দাঁড়াইতে পারে বা সৃষ্টির উপর একটী নূতন সৃষ্টি হইয়া উঠিতে পারে * * এমনকি সমালোচনার বিশ্লেষণও যে, রসগর্ভ হইয়া উপন্যাস ও নাটকের মতই কৌতূহল বর্দ্ধন করিতে পারে; গ্রন্থকার বঙ্কিম-চিত্রে তাহা দেখাইয়াছেন।

প্রবর্ত্তক। (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩) ইহার আলোচনা যেমন তলস্পর্শী, মর্ম্মগ্রাহী ও মনোহর, ভাষাও তেমনি স্বচ্ছ, আদর্শ-স্থানীয়। বইখানি কলেজের পাঠ্যরূপে অনায়াসে স্থান পাইতে পারে। সুসাহিত্য-রসিক বৃন্দের নিকট ইহা খুব আদরণীয় হইবে।